সূচীপত্র

অণিমা আবার গম্ভীর হয়ে যায়—বুঝতে পারছি না।

সুহাসিনীর মুখটাও যেন একটু করুণ হয়ে যায়। মীরার ইচ্ছা, উপদেশ আর পরামর্শের কথাগুলিকে খুশি হয়ে মেনে নিতে সুহাসিনীরও মনের কোথায় যেন বাধছে। খুবই সুখের কথা হতো, যদি সৌরভ নিজেই এসে একবার অণিমাকে দেখতো আর পছন্দ করে ফেলতো। একটা অচেনা মানুষের চোখে পছন্দ ধরাবার জন্য মেয়েটা নিজেই দৌড়াদৌড়ি করবে, কালের নিয়ম হলেও ভাবতে ভাল লাগছে না।

তবে একথাও ঠিক, সৌরভের মত ছেলে নিবারণবাবুর মত অবস্থার মানুষের আশার কাছে দুর্লভ উপহার। এককালে অবস্থা খুবই ভাল ছিল। এখন সে অবস্থা আর নেই। শুধু মস্ত বড় এই বাড়িটা আছে; আর একটা গালাকুঠি আছে। গালার বাজারও আর সেরকম নয়। বছর দুই হলো গাড়িটাকে বেচে দিতে হয়েছে। মেয়ের বিয়ের জন্য পাঁচ-সাত হাজার টাকা খরচ করবার সামর্থ্য অবশ্য আছে কিন্তু পাঁচ-সাত হাজারের খরচে যেসব ছেলে পাওয়া যায়, আর এ পর্যন্ত যেসব ছেলের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, তাদের একজনও গুণে ও গৌরবে সৌরভের কাছাকাছি দাঁড়াবার যোগ্য নয়। তাই মীরার চিঠির পরামর্শটা মেনে নিতেই ইচ্ছে করছে।

দুই

সৌরভের জন্য বেশ ভাল একটা বাড়ি ঠিক করে ফেলতে দেরি করেননি নিবারণবাবু। টাউন থেকে সামান্য দূরে হিল কানারি যাবার রাস্তার উপরেই ইউকালিপটাসে-ঘেরা একটি বাড়ি। সবুজ ঘাসে ছাওয়া লন আছে। লনের দু'পাশে স্থলপদ্মের ভিড় নিয়ে দুটো স্কোয়ার আছে। ফটকের থামের গায়ে আইভিলতা আর সারি সারি

টবেতে গাজিপুরী গোলাপ। মালী বৃন্দাবন বাগান থেকে সব শুকনো পাতা ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়েছে।

সৌরভ সরকারও এসেছে। সঙ্গে এসেছে কুক, চাপরাসী, বেয়ারা আর চাকর।

সৌরভ যেদিন এল সেদিন স্টেশনেই উপস্থিত ছিলেন নিবারণ বাবু। ট্রেন থেকে নেমে সৌরভই নিবারণবাবুর হাসিভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল—আপনিই বোধহয় নিবারণবাবু!

—হ্যাঁ।

—বাড়িটা কোন্ দিকে?

—এই যে মালী বৃন্দাবনও এসেছে। বৃন্দাবনই তোমাদের পথ দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাবে।

দুটো ট্যাক্সি সৌরভ সরকারের সব জিনিসপত্র আর চাকর-বাকরদের তুলে নিয়ে চলে গেল। আগে আগে একটা ট্যাক্সিতে চলে গেল সৌরভ সরকার আর মালী বৃন্দাবন।

সন্ধ্যা হবার একটু আগেই অণিমাকে সঙ্গে নিয়ে যখন হিল রোডের বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়ান নিবারণবাবু; তখন বাড়ির বারান্দায় একটি চেয়ারের উপর বসে বই পড়ছিল সৌরভ সরকার। সত্যিই বড় চমৎকার চেহারা। পঁয়ত্রিশ বছর নয়, এ চেহারায় বয়স ত্রিশের বেশি হতেই পারে না। সাদা জিনের ট্রাউজার আর সাদা টুইলের সার্ট পরে; আর সাদা চামড়ার শ্লিপার পায়ে দিয়ে চেয়ারের উপর বসে আছে একটি চমৎকার পরিচ্ছন্ন আর স্নিগ্ধ চেহারা। নিবারণবাবুর চোখ দুটোও যেন একটা স্নেহাক্ত আগ্রহে চঞ্চল হয়ে চিকচিক করতে থাকে।

অণিমাও বালুচর শাড়ি পরেছে। কিন্তু বাড়ি থেকে বের হয়ে এই সামান্য আধমাইলের ছায়াময় রাস্তাটা হাঁটতেও যেন বারবার হোঁচট খেয়েছে। ভয়ানক অপ্রসন্ন দুটো চোখ বারবার যেন ভ্রূকুটি করে

কুঁচকে গিয়েছে। দুঃসহ একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস বুকের ভিতরে একটা যন্ত্রণা ছড়িয়েছে। ছি-ছি; সৌরভ সরকার হলোই বা একটা মস্ত গৌরব আর মস্ত সৌভাগ্য; কিন্তু অণিমার ত্রিশ বছর বয়সের প্রাণটা যে এভাবে একটা কাঙাল লোভের মত এগিয়ে যেতে চাইছে না। একটুও ভাল লাগছে না।

নিবারণবাবু আর অণিমাকে দেখতে পেয়ে ব্যস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সৌরভ। নিবারণবাবু হাসেন—আমি তোমাকে বিরক্ত করতে আসিনি। অণিমা কি বলবে তাই শুনে নাও।

—কে? সৌরভ যেন চমকে উঠে প্রশ্ন করে।

নিবারণবাবু বলেন—এই তো অণিমা, আমার মেয়ে।

অণিমা হাসে—বিরক্ত বোধ করলেও আপত্তি করতে পারবেন না। আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়িতে চা খাবেন।

সৌরভের বিস্ময়ের চোখ দুটো এবার যেন মুগ্ধ হয়ে হেসে ওঠে। —বিরক্ত বোধ করবো কেন? কখ্খনো না। আচ্ছা…নিশ্চয় যাব।

চলে যান নিবারণবাবু আর অণিমা। যে পথে দুঃসহ অস্বস্তির হোঁচট খেয়ে খেয়ে অণিমার প্রাণটা কোনমতে হেঁটে এসেছিল, সেই পথেই আবার ফিরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু অণিমার সেই অস্বস্তির ভার যেন লজ্জা পেয়ে এই রাস্তারই ধূলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। চোখের সেই অপ্রসন্ন ভ্রূকুটিই বা কোথায় গেল? বালুচর শাড়িটাকেও আর কাঙাল লোভের সাজ বলে মনে হয় না। বরং মনে হয়, শাড়িটাকে কি বিশ্রীভাবে এলোমেলো করে পরা হয়েছে। যেন ভয়ে ভয়ে একটা মেঘ দেখতে গিয়েছিল অণিমা, কিন্তু একটা চাঁদ দেখে ফিরে এসেছে।

তিন

হিল রোডের বাড়িতে ফুল পাঠাতে ভুল করেনি অণিমা। যাকে দেখবার জন্য মনটা সব সময় উৎসুক হয়ে থাকে, সেও হিলরোড ধরে বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসে গালাকুঠির মালিক নিবারণবাবুর টাউনের বাড়িতে আরও দুদিন চা খেয়ে চলে গিয়েছে। দেখে আশ্চর্য হয়েছেন নিবারণবাবু, আর বেশ খুশিই হয়েছেন সুহাসিনী : মুখচোরা মেয়ে অণিমা তিনদিনের চেনা এই সৌরভের সঙ্গে এক-এক সময় যেন নাকে-মুখে কথা বলতে থাকে। সেই ভীতু-ভীতু অণিমা নয়, এখন যেন একটা ব্যস্ত হাসির অণিমা ঘরের বাইরের বারান্দায় ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যা হলেই যেন ছটফট করতে থাকে। সাজ সারতে আধঘণ্টারও বেশি সময় পার হয়ে যায়, তবু অণিমার শাড়ি আর সাজ যেন অণিমার চোখের পছন্দ হয়ে উঠতে পারে না। এরই মধ্যে একদিন নিজেরই চোখে দেখতে পেয়েছেন সুহাসিনী, চলে যাবার সময় ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে সৌরভ যেন খুব আস্তে খুব ব্যাকুলতার একটা কথা বললো; তা না হলে কথাটা বলতে গিয়ে সৌরভের মুখটা ওরকম লাজুক হয়ে যাবে কেন? অণিমাও যেন চমকে উঠেছে। তার পরেই মাথা হেঁট করেছে। তারপরেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ করেছে। মেয়েটার সারা মুখটাও যে লালচে হয়ে উঠেছে।

না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারেননি সুহাসিনী—সৌরভ কিছু বলে গেল নাকি?

—হ্যাঁ।

—কি বললে?

—আজ সন্ধ্যেবেলা সঙ্গে বেড়াতে যেতে বলছে।

—যা তবে।

—যাব।

সন্ধ্যা হবার আগেই বের হয়ে যায় অণিমা। আজ একাই হিলরোডের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে বেড়াতে বের হতে হবে, যার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে আর কিছু বাকি নেই অণিমার, শুধু আজকের জন্যে এই আহ্বান নয়, চিরকালের জন্য। মীরা পিসিমা যেন মিছিমিছি একটা ভয় দেখিয়েছিলেন; যেন একটা তপস্যার জন্য অণিমাকে প্রস্তুত হতে বলেছিলেন; কিছুই দরকার হয়নি; মুখ খুলে বেহায়ার মত স্পষ্ট করে একটা কথাও বলতে হয়নি। স্নিগ্ধ হাসির মানুষটার নিজেরই চোখ দুটো বার বার পিপাসিতের মত অণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে কত স্পষ্ট করে সবই বুঝিয়ে দিয়েছে, অণিমার আশার মনটাকে ধন্য করে দিয়েছে।

হিলরোডের উপর একটা দেবদারুর কাছে দাঁড়িয়ে আছে সেই অভ্যর্থনা, সেই সাদা জিনের ট্রাউজার আর টুইলের শার্ট। পায়ে সাদা চামড়ার শু। চোখ দুটো কালো নয়, কেমন যেন নীলাভ আর নিবিড়। এক এক সময় মনে হয়, সে চোখে যেন নীল আকাশের ছায়া হাসছে।

অণিমা হাসে—মনে হচ্ছে, কিছু সন্দেহ করে রাস্তার উপর এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

—কিসের সন্দেহ ?

—মনে করেছিলেন বোধ হয়, আমি আসবোই না।

—তা একবার মনে হয়েছিল ঠিকই।

—কেন ?

—এখানে এসে এই তিনদিনের মধ্যেই এত বড় একটা উপহার পেয়ে যাব, এতটা যে বিশ্বাস করতে সাহসই হয়নি, অণিমা। কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি যে, তোমার মত মেয়ে আমার মত মানুষের একটা অনুরোধের কথা শুনে…।

—ওকথা বলো না।

—কেন ?

—তোমার মত মানুষ আমাকে ডাকতে পারে, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে সাহস পাই নি।

হিলরোড ধরে অনেকদূর এগিয়ে যায় অণিমা আর অণিমার ভালবাসার সৌরভ। রোডটা যেখানে খুব বেশি নিরিবিলি, সেখানে দুজনে হাত ধরাধরি করে হেঁটে যেতেও ভুলে যায় না। মাঝে মাঝে অণিমার গলার উচ্ছল হাসির শব্দ শুনে সড়কের পাশের করোঞ্জ গাছের কাক ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে যায়।

হিলরোড ধরে ফেরবার পথটাও আবছায়াময় সন্ধ্যার মায়ায় ঢাকা পড়ে যেন কল্পলোকের একটা কুহকের পথ হয়ে যায়। সত্যিই তো, কোনদিন কল্পনাতেও অনুভব করতে পারেনি অণিমা, মনের মত সঙ্গীর হাত ধরে পথ চলতে হলে প্রাণটা এমন বিহ্বল হয়ে যায়।

—চল তোমাকে তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি, অণিমা।

অণিমা হাসে—এখনই পৌঁছে দেবে ?

—ইচ্ছে তো করে না ; কিন্তু আজ আর উপায় নেই।

—কেন ?

—এখনই একবার স্টেশনে যাব।

—কেন ?

—সাহেব আসবেন বোধহয়।

—কোথাকার সাহেব ?

—ইঞ্জিনিয়ার সরকার সাহেব।

—সরকার সাহেব কে ?

—সৌরভ সরকার। তোমার মধুপুরের পিসিমাদেরই তো কি-রকমের যেন আত্মীয় হন।

অণিমার বুকের ভিতর থেকে দুঃসহ একটা আর্তনাদ যেন গুমরে ওঠে।—কি বলছো তুমি ? কি ভয়ঙ্কর কথা !

—কি বললে ?

—তুমি কে ?

—আমি হলাম···আমি।

—কে তুমি ? ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে অণিমা।

—আমি তো সরকার সাহেবের স্টেনো-টাইপিস্ট ক্লার্ক।

—তোমার নাম কি ?

—তাও জান না ?

—না।

—এ তো বড় আশ্চর্যের কথা।

—যতই আশ্চর্যের কথা হোক্, বল, বলে ফেল, তাড়াতাড়ি বলে দাও।

আমি বিনয় দত্ত।

—তুমি তাহলে সরকার সাহেব আসবার আগেই ···।

—হ্যাঁ, স্টাফ তো আগেই আসে ; তারপর সাহেব।······ কিন্তু······আমি যে ব্যাপারটা এবার বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, অণিমা।

—কি বুঝেছ ?

—তুমি ভুল করে আমাকেই সরকার সাহেব মনে করে···আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি অণিমা। তুমি সব ভুলে যাও। তোমার বাবাকে বলো, তিনিও যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

হিলরোডের সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে অণিমা যেন অদৃষ্টের একটা বিদ্রূপের করুণ ভাষার আক্ষেপ শুনছে। স্টেনো-টাইপিস্ট বিনয় দত্তের গলার স্বর যেন আবার ভয় পেয়ে ছটফটিয়ে ওঠে,—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সরকার সাহেব এলেই তাঁর কাছ থেকে

যে-ভাবেই হোক্ ছুটি আদায় করে আমি দু'দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব।

অণিমা বলে—আপনি এখন যান। শিগগির চলে যান।

স্টেশনের দিকে চলে যায় বিনয়; আর অণিমা তার বালুচরের শাড়ির আঁচলটাকে দাঁতে চেপে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি ফিরে যায়।

চার

সকাল বেলা একটা চিঠি হাতে নিয়ে হাসতে থাকে অণিমা। মধুপুরের মীরা পিসিমা লিখেছেন চিঠিটা। খামের চিঠি নয়, একটা পোষ্টকার্ড। অণিমার কাছে নয়, নিবারণবাবুর কাছেই এই চিঠি দিয়েছেন মীরা। —সৌরভ কলকাতা গিয়েছে। বোধ হয় দিন সাত পরেই তোমাদের ওখানে পৌঁছে যাবে। সৌরভের স্টেনো-ক্লার্ক বিনয়কে বলে দিও, যেন স্টেশনে উপস্থিত থাকে।

সুহাসিনী বলেন—কার চিঠি পড়ে এত হাসছিস ?

—মীরা পিসিমার চিঠি।

—কি লিখেছে মীরা ?

—লিখেছেন, সৌরভ সরকার এখন কলকাতায় আছেন।

—তার মানে ?

—তার মানে সৌরভ সরকার এখনো এখানে আসেন নি।

—কি বলছিস পাগলের মত ?

—পাগলের মত নয়; পাগল হয়েই বলছি।

নিবারণবাবু ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে আসেন। আর অণিমার মুখটার দিকে আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে থাকেন। —কি হলো ?

—সৌরভ সরকারের স্টেনো ক্লার্ক বিনয় দত্ত তোমাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

—কে বিনয় দত্ত ?

—ঐ যে, যাকে সৌরভ সরকার বলে মনে করা হয়েছে, যাকে তিন দিন নেমন্তন্ন করে চা খাওয়ানো হলো।

নিবারণবাবু আর সুহাসিনী যেন আর্তনাদ করবারও শক্তি হারিয়েছেন। যেন একটা হিংস্র কৌতুকের আক্রমণে আহত দুটো অসহায় অদৃষ্ট; মাথা হেঁট করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সুহাসিনী আর নিবারণবাবু।

নিবারণবাবুর চোখ দুটো ভিজে গিয়ে আরও করুণ হয়ে ওঠে; আর সুহাসিনীর চোখ দুটো জলে ভেসে যায়।

কিন্তু চেঁচিয়ে হেসে ওঠে অণিমা—আমাকে এখনই একবার বের হতে হচ্ছে।

নিবারণবাবু আর সুহাসিনী, দু'জনেই মুখ তুলে তাকান। সত্যিই যে বেশ সুন্দর করে সেজেছে অণিমা। সত্যিই বাইরে যাবে মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথায় যাবে? ওরকম অদ্ভুত ভাবে হাসছেই বা কেন ?

সুহাসিনী—কোথায় যাবি ?

—যার কাছে জোর করে পাঠাতে চেয়েছিলে, তার কাছে।

—তার মানে ?

—দেখে আসি, সৌরভ সরকার এসেছেন কিনা। বোধহয় এসেছেন।

—না, এখনই যেয়ে কাজ নেই।

—এত ভয় পাচ্ছ কেন ?

—মনে হচ্ছে, তুমি ভুল করে যত আবোল-তাবোল কথা বলে ফেলবে।

—কিছ্ছু ভুল হবে না, কোন আবোল-তাবোল কথা বলবো না। মীরা পিসিমা যা বলে দিয়েছেন, ঠিক তাই বলবো।

সুহাসিনী আর নিবারণবাবু বেশ কিছুক্ষণ ধরে অপলক চোখ তুলে অণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন কালের নিয়মের আরও একটা বিস্ময় দেখছেন। নিয়মটা সত্যিই যে একটা প্রজাপতি। এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছে, এতক্ষণ কোথায় ছিল আর কোন্ বনের ফুলের পরাগ পাখায় মেখেছিল। অণিমার হাসিটাও যেন একটা নতুন ব্যস্ততা। কালকের সন্ধ্যাবেলার হাসিটাকে আর সেই হাসির মনটাকেও বোধহয় তুচ্ছ অকেজো ধুলোর মত একেবারে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছে অণিমা।

সুহাসিনী আর নিবারণবাবুর চোখে একটা আতঙ্কও যেন থম্‌কে রয়েছে। মেয়েটার ভাগ্যটা নতুন আশা নিয়ে আবার একটা নতুন বিদ্রূপের কাছে যাচ্ছে না তো?

অণিমা বলে—তোমরা খুবই ভাবছো বলে মনে হচ্ছে।

সুহাসিনী—নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

অণিমা—কেন?

সুহাসিনী—সত্যি করে বল্, সৌরভেরই সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস তো?

অণিমা হাসে—সত্যি সত্যি সত্যি।

নিবারণবাবু কোন কথা না বলে আবার ঘরের ভেতরে চলে যান। সুহাসিনী বলেন—সৌরভকে কি বলবি?

অণিমা—যা বলা উচিত, যা বলে দিয়েছেন মীরা পিসি, তাই বলবো। চা খেতে নেমন্তন্ন করবো।

সুহাসিনী যেন কুণ্ঠিত ভাবে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়েন,—আয় তবে।

পাঁচ

লনের ঘাসের উপরে বেতের চেয়ারে বসে আছেন সৌরভ সরকার। বেশ দৃঢ় বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ; বেশ হাসি-হাসি মুখ। গলা থেকে খুলে-নেওয়া টাইটাকে কাঁধের উপর ফেলে রেখেছেন। দাঁতে পাইপ কামড়ে ধরে এক মনে খবর-কাগজ পড়ছেন।

ফটকের থামের গায়ে আইভিলতা দুলছে। একবার থমকে দাঁড়ায় অণিমা। যেন একটা মূর্চ্ছার ঘোর হঠাৎ ভেঙে গিয়েছে; তাই হঠাৎ চমকে উঠেছে অণিমা। কেন? কিসের জন্য? কোথায় কার কাছে ছুটে চলেছে অণিমার উদ্ভ্রান্ত ইচ্ছাটা? সত্যিই কি সৌরভ সরকারের কাছে কোন আশা নিয়ে আর অদ্ভুত এক লোভের অভিসারের নায়িকা হয়ে এখানে এসেছে অণিমা? কিংবা, সৌরভ সরকারের সঙ্গে দেখা করবার ছুতো করে আর কাউকে দেখতে এসেছে?

না, চলে যায়নি। ঐ যে, এখনও ঐ বারান্দার উপরে একটা টেবিলের কাছে বসে আছে সেই ক্ষমা-চাওয়া আর আতঙ্কিত আত্মাটা; হাতের পাশে একগাদা কাগজের ফাইল। ছোট টাইপরাইটার মেশিনটাকে প্রায় বুকের কাছে টেনে নিয়ে আর মাথা ঝুঁকিয়ে ব্যস্ত-ভাবে টাইপ করছে। ঠুক্ ঠুক্, ঠুক্ ঠুক্, শব্দ করে বাজছে টাইপ-রাইটার। যেন বিনয় দত্ত নামে নিতান্ত একটা কাজের মানুষের পাঁজরা শব্দ করে বাজছে। ঐ মানুষ আর কালকের সেই মানুষ নয়।

মুখ তুলে একবার তাকিয়েছে বিনয় দত্ত; কিন্তু চোখের ঐ শান্ত উদাস ভাবটা দেখে মনে হয়, অণিমাকে জীবনে কোন দিন দেখেনি বিনয় দত্ত। অণিমার চোখে ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে।

—আসুন। ডাক দিয়েছে সৌরভ সরকার। চমকে ওঠে অণিমার আনমনা কৌতূহলের চোখ দুটো। বুঝতেই পারেনি অণিমা, বারান্দার

দিকে তাকাতে তাকাতে কখন সৌরভ সরকারের এত কাছে চলে এসেছে অণিমার ছায়াটা।

এইবার যেন অণিমার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে একটা প্রশ্ন চিৎকার করে ওঠে, কেন এসেছো? সৌরভ সরকার তো বেশ হেসে হেসে আর বেশ ভদ্রতানম্র ভঙ্গীতে ডাক দিয়েছে। কিন্তু অণিমার অন্তরাত্মা তবে এমন অপ্রস্তুত হয়ে যায় কেন?

এমন আহ্বান শুনতে পাবে বলে বোধহয় কল্পনা করতে পারেনি অণিমা। যেন বাবা মা আর মীরা পিসিমাকে একটা বাজে স্বপ্নের ভুল ধরিয়ে দেবার জেদ নিয়ে এখানে এসেছে অণিমা। যেন একটা পরীক্ষাকে একটু পরীক্ষা করে চলে যেতে হবে। সৌরভ সরকারকে একবার চা খেতে নেমন্তন্ন করতে হবে। তার পর বাবা আর মা দেখতেই পাবেন, আর মীরা পিসিও চিঠি পেয়ে জানতে পারবেন, সৌরভ সরকার নিবারণবাবুর বাড়ির চায়ের নেমন্তন্ন শুনে মনে মনে হেসেছে; যেতে ভুলেও গিয়েছে; দেড় হাজার টাকা মাইনের মানুষ এক দেউলে-গোছের গালা-মার্চেন্ট নিবারণবাবুর মেয়েকে একটু করুণার চক্ষেও দেখবার সময় পায়নি।

ঠিকই, অণিমার মুখের সেই ব্যস্ততার হাসিটাকে ঠিক বুঝতে পারেননি নিবারণবাবু আর সুহাসিনী। সৌরভ সরকারের মত গৌরবকে তপস্যা করলেও যে নিবারণবাবুর মত মানুষের মেয়ের কোন লাভ হবে না, এই সহজ সরল সত্যটাকে পৃথিবীকে বুঝিয়ে দেবার জন্য অণিমা যেন দুঃসাহস করে একটা ভূয়া অভিসারে এখানে এসেছে।

সৌরভ হাসে।—বসুন আপনি। আপনাকে আপনার পরিচয় আর বলতে হবে না। আমি জানি কে আপনি। মীরা বউদি আপনাদের কথা আমাকে আগেই বলে রেখেছেন।

হাসতে চেষ্টা করে অণিমা; কিন্তু হাসিটা যেন একটা এলোমেলো করুণ হাসি। সে করুণ হাসি আরও এলোমেলো হয়ে যায়; যখন

সৌরভ সরকারের চোখদুটো বেশ নিবিড় হয়ে অণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সৌরভ বলে -আপনি এসেছেন; খুবই ভাল লাগছে।

ভুলেই গিয়েছে অণিমা, তাই প্রাণপণে স্মরণ করতে চেষ্টা করে; কি যেন বলবার ছিল? কি যেন বলবার জন্যে এখানে এসেছে অণিমা? চিঠিতে কি যেন লিখেছিলেন মীরা পিসিমা?

সৌরভ সরকার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে খুশির স্বরে হাসতে থাকে।—চলুন, আপনার বাবা আর মা'র সঙ্গে দেখা করে আসি।

অণিমা বলে—বাবা আর মা দু'জনেই বলে দিয়েছেন...।

—কি?

—আপনি আজ আমাদের বাড়িতে চা খাবেন।

—তবে আর দেরি করি কেন?

কাঁধের উপর ফেলে-রাখা টাইটাকে ট্রাউজারের পকেটে পুরে দিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে সৌরভ সরকার—চলুন।

ফটকের থামের গায়ে জড়ানো আইভিলতায় যেন ঝড়ো হাওয়ার টান লেগেছে। পাতাগুলি যেন ছিঁড়ে পড়তে কিংবা উড়ে যেতে চায়। ভয়ানক দুলছে, ভয়ানক কাঁপছে। মনে হয় অণিমার, যেন সৌরভ সরকারের উচ্ছল খুশির বাতাসটাই ঝড় হয়ে উঠেছে। ফটকটা পার হবার সময় সৌরভ সরকার যেন নিজের মনের খুশির আবেগে বলে ওঠে।—ভালোই হলো; তিন চারটে দিন তেমন কোন কাজও নেই। খুব কুঁড়েমি করে নেওয়া যাবে; নয়তো আপনাদের বাড়ির চায়ের আসরে বসে...অবশ্য আপনি যদি বলেন, তবেই যাব।

—কি বললেন?

—আপনি যদি বলেন, তবে যাব।

—যাবেন বইকি। রোজই যাবেন।

—রোজই সম্ভব হবে না, অণিমা। আমার স্টেনো-ক্লার্ক বিনয়

ছুটি নিয়ে আজই সন্ধ্যার ট্রেনে চলে যাচ্ছে। তাই, তিন-চারটে দিন, তার মানে নতুন ক্লার্ক না আসা পর্যন্ত একটু জিরিয়ে নিতে পারা যাবে।...কি হলো ?

রাস্তার পাশের একটা গাছের গায়ে হাত দিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছে অণিমা। যেন মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল, টলে উঠছিল পা দুটো; আর চোখে কিছু দেখতেও পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই বিবশ শরীরটাকে সামলাবার জন্য গাছের গায়ে হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে অণিমা।

অণিমা বলে—না, কিছু নয়।

কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকায় অণিমা; যেন পিছন থেকে কেউ অণিমার বালুচর শাড়ির আঁচলটাকে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েছে। দেখতে পাওয়া যায়, বারান্দার উপরে একেবারে শান্ত ও সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিনয় দত্ত। এদিকেই তাকিয়ে আছে। যেন সত্যিকারের একটা কুহকের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে।

ছয়

সুহাসিনী বলেন—সৌরভ যা বলে গেল, তাতে তো এই ধারণাই করতে হয় যে, সৌরভের আপত্তি নেই।

নিবারণবাবু—আমার ধারণাও তাই। আর কত স্পষ্ট করে বলবে ?

আস্তে আস্তে নয়; বেশ জোরে, যেন কাউকে শোনাবার জন্যই কথাগুলি বলছেন নিবারণবাবু আর সুহাসিনী। ঘরের ভিতরে বসে অণিমাও শুনতে পায়। শুনেও অণিমার চোখে-মুখে কোন কৌতূহল চঞ্চল হয়ে ওঠে না। কারণ অণিমারও যে তাই ধারণা।

চা খেয়ে আর অনেকক্ষণ বসে নিবারণবাবু আর সুহাসিনীর সঙ্গে

অনেক গল্প করেছে সৌরভ। যাবার সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আর বেশ স্নিগ্ধস্বরে অণিমাকে যে কথাটা বলেছে সৌরভ, সেকথা সুহাসিনী আর নিবারণবাবু ঘরের ভিতরে বসেই শুনতে পেয়েছেন।

—মীরা বউদি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, অণিমা।…কিন্তু থাক্, আজ আর বলতে চাই না। এত তাড়াতাড়ি বলে ফেলা বোধহয় উচিত নয়।

চলে যায় সৌরভ। আর অণিমা সেই যে ছটফটিয়ে ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতরে বসেছে, তারপর এতক্ষণের মধ্যে একবারও বাইরে আসেনি, একটা কথাও বলেনি।

কিন্তু চমকে ওঠেন নিবারণবাবু আর সুহাসিনী। ঘর থেকে বের হয়েছে অণিমা; আর, কি আশ্চর্য, যেন বাইরে যাবার জন্যই সেজেছে। আজই এই সন্ধ্যায় আবার কোথায় যাবার জন্যে মেয়ের মন এত ব্যস্ত হয়ে উঠলো? এ কি? কাঁদে কেন মেয়েটা?

—কি হলো? চেঁচিয়ে ওঠেন সুহাসিনী।

—আমি যাচ্ছি।

—কোথায়?

—স্টেশনে।

—স্টেশনে কেন?

—বিনয় বোধহয় সন্ধ্যার ট্রেনেই চলে যাবে।

—চলে যাক্ না বিনয়।

—যাবে কেন?

—বিনয়ের ইচ্ছা বিনয় চলে যাবে। বিনয়ের কাছে তোর কিসের কাজ?

—কাজ আছে বইকি। তা না হলে যাব কেন?

—কি কাজ?

—ডেকে নিয়ে আসি।

—কেন ?

—যাবার আগে এ বাড়ির চা খেয়ে যাক্।

—বিনয় আবার এখানে এসে চা খাবে কেন ?

—তোমাদের মেয়ের সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে হবে বলে।

—কে বললে ?

—আমি বলছি।

নিবারণবাবুর মুখের দিকে তাকান সুহাসিনী। তার পর তুজনেই একসঙ্গে অণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কি বলতে চাইছে অণিমা ? আজকের সকাল বেলার হাসিটাই মিথ্যে ; আর এই সন্ধ্যার কান্নাটাই তাহলে সত্যি ?

নিবারণবাবু বলেন—আমার আর কিছু বলবার নেই।

সুহাসিনী বলেন—আমি ভাবছি, মীরাকে আমি তবে বোঝাবো কি বলে ?

হেসে ফেলে অণিমা—একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে, ভগবানের ইচ্ছেয় যা হবার ছিল, তাই হলো।



অভ্যর্থনা

খুব ভাল জায়গায় বাড়িটা পাওয়া গিয়েছে। দেখে খুশি হয়েছে নমিতা; আর বেশ একটু নিশ্চিন্তও হয়েছে। সকাল সন্ধ্যা দু'বেলা নিশ্চিন্ত মনে বেড়াতে পারা যাবে; কারণ নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াবার মত চমৎকার একটা জায়গা বাড়ির সামনেই রয়েছে।

জায়গাটা হলো বেশ বড় একটা ডাঙা। পাহাড়ের দেশের ডাঙা যেমন হয়, তেমনি; কোথাও ঢালু, কোথাও চড়াই; কোথাও ঘাস, কোথাও কাঁকর। কোথাও দু চারটে বিরাট আকারের পাথরের সমাবেশ; অনেক দূর থেকে দেখলে মনে হবে, দু-চারটে হাতী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও বুনো কুলের ছোট জঙ্গল, কোথাও আমলকীর ঝোপ।

ডাঙার ঢালু যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে শীর্ণ চেহারার একটা জলের ধারাও আছে। ছোট ছোট নুড়ির উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে ছোট্ট জলস্রোত।

স্রোতটা পার হলেই নানারকম কাঁটাগাছের একটা ভিড়; দেখতে ছোট্ট একটা জঙ্গলের মত। সেই কাঁটাগাছের ভিড়ের সঙ্গে দু'চারটে করবী আর কাঠগোলাপও যেন গা ঢাকা দিয়ে মিশে আছে। মস্ত একটা বটও আছে সেখানে। কাঁটাজঙ্গলের উপর বটের ছায়াও লুটিয়ে পড়ে থাকে। আর, দুপুরের বাতাস যখন ঝড় হয়ে ছুটোছুটি করে, তখন এই কাঁটাজঙ্গলও যেন ছটফটিয়ে দুলতে থাকে। তখন দেখা যায় এই কাঁটাজঙ্গলের ভিতরে স্তব্ধ হয়ে কয়েকটা সমাধির চেহারাও লুকিয়ে আছে। কে জানে কাদের সমাধি!

এই ডাঙায় কেউ বেড়াতে আসে না। সড়কটা এখান থেকেই ঘুরে ফিরে পাহাড়তলীর পার্কের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। কাজেই এ সড়কে আর পাহাড়তলীর ঐ পার্কের কাছেই বেড়াবার জন্য মানুষেরা ভিড় করে। এই ডাঙার কাঁকর আর চোরকাঁটা মাড়িয়ে ঘুরে বেড়াবার কোন দরকার হয় না।

এই ডাঙায় কেউ বেড়াতে আসে না, এটাই নমিতার জীবনের একটা শান্তি আর স্বস্তি। প্রত্যেক বছর ছোটকাকা আর কাকিমার সঙ্গে কোন পাহাড়ের দেশে গিয়ে ছুটির একটা মাস কাটিয়ে দিয়ে আসতে হয়। বেড়াবার মত অনেক সুন্দর জায়গাও পাওয়া যায়। এই তিন বছর তিনটে চমৎকার পাহাড়ী শহরে গিয়ে তিনটে ছুটির জীবন কাটিয়েছে নমিতা। বেড়িয়েছে অনেক। কিন্তু অস্বস্তিও ভুগেছে অনেক।

বেড়াবার জায়গাগুলি চমৎকার, কিন্তু ভিড়টা মোটেই চমৎকার নয়। ভিড়ের চোখের চেহারা আরও অস্বস্তিকর। মানুষগুলি যায় আর আসে, পথের দু'পাশে দেখবার মত কত ফুলভরা গাছ আছে; কিন্তু লোকের চোখ যেন সব দৃশ্য ছেড়ে দিয়ে শুধু নমিতার মুখের দিকে তাকায়। তাকাবার ভঙ্গীগুলিও কত বিচিত্র। কারও চোখ ফ্যালফ্যাল করে, কারও চোখ মিটমিট করে, কারও কারও চোখ যেন একেবারে তীব্র হয়ে আর ধিক ধিক করে তাকায়। দুঃসহ। বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করে নমিতা। একটু একলা হয়ে ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াবার আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়। নমিতা যেন একটা একলা বনহরিণী, হঠাৎ পথের ভিড়ের কাছে এসে পড়েছে। লোকগুলির চোখে যেন এইরকম একটা বিস্ময় ক্যাংলা হয়ে ছটফট করে। অগত্যা নমিতাকে তাড়াতাড়ি হেঁটে বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছে।

কিন্তু এই জায়গাটা সে-রকম কোন অস্বস্তির জায়গা নয়। একেবারে নির্জন একটি প্রান্তর। যতক্ষণ ইচ্ছে ততক্ষণ যে-কোন

পাথরের উপর চুপ করে বসে থাকা যায়। যে-কোন বুনো ফুলের ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ খুশি ঘুঘুর ডাক শুনতে পারা যায়। বাড়িটাও খুব কাছে। হঠাৎ মেঘ দেখা দিলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরাও যায়। এখানে নমিতা যদি সত্যই বনহরিণীর মত ছুটাছুটি করে, তবুও কেউ বাধা দেবে না। কোন বাধার ছায়াও এখানে ঘুরে বেড়ায় না।

কিন্তু, কি আশ্চর্য, সত্যিই যে একটা বাধা দেখা দিল। পাহাড়-তলীর কাছে এত বড় ও এত চমৎকার একটা পার্ক পড়ে আছে, তবু সেখানে না গিয়ে ভদ্রলোক এই নির্জন ডাঙাটাকেই বেড়াবার জন্য বেছে নিয়েছেন। আর, বেড়াবার সময়টাকে বেশ বুঝে সুঝে ঠিক করে নিয়েছেন। রোজই দেখতে পায় নমিতা, ভদ্রলোক সড়ক থেকে নেমে এই ডাঙার মাঝখানের সরু হাঁটুরে পথটা ধরে এগিয়ে চলেছেন।

সকাল বেলা, নমিতা ঠিক যখন বেড়িয়ে ফিরে আসে, ঠিক তখন এই ভদ্রলোক বেড়াবার জন্য এগিয়ে যান, যে পথে ফিরে আসছে নমিতা, সেই পথে এগিয়ে যান ভদ্রলোক। তাই পথের কোন না কোন জায়গায় দু'জনের মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। আর দু'জনের ছায়া পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। একজন যায়, একজন আসে।

দুঃসহ অস্বস্তি। ভদ্রলোক যেন একটা নিয়মিত চেষ্টার মতলব। একটা দিনও সময়ের ভুল হয় না।

সকালের রোদ যখন পাহাড়ের গায়ে ঝলমল করে উঠেছে; ডাঙার আমলকীর ঝোপটা পার হয়ে নমিতা বাড়ির দিকে অনেকখানি এসে পড়েছে; ঠিক তখন ভদ্রলোক যেন আমলকী ঝোপটার দিকে একটা পিপাসিত দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকেন। দেখতে পেয়েই নমিতার নিঃশ্বাসের অস্বস্তিটাও যেন ফুঁসে ওঠে। চোখে একটা ভ্রূকুটিও কাঁপতে থাকে। ভদ্রলোকের ব্যস্ততাকে একটা গোপন ইচ্ছার ব্যস্ততা বলে মনে হয়।

নিতান্ত নির্লজ্জ একটা লোভের ব্যস্ততা। ভদ্রলোক বেশ দূর থেকেই আসেন বলে মনে হয়। এখানে, এই ডাঙার কাছে শুধু নমিতাদের এই একমাসের মত ভাড়া-নেওয়া বাংলো বাড়িটা ছাড়া আর কোন বাড়ি নেই। এ বাড়ির মেয়ে এই ডাঙাতে ঘুরে বেড়াবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা লোক অনেক দূরে টাউনের কোন্ এক পাড়া থেকে এতদূরে এসে ঠিক এই ডাঙাটাতে ঘুরে বেড়াবে, এর চেয়ে অস্বাভাবিক ইচ্ছা আর আচরণ আর কি-ই বা হতে পারে?

তবে কি এই ডাঙাতে বেড়াবার সাধই ছেড়ে দেবে নমিতা? ভাবতে গিয়ে নমিতার প্রাণটাই যেন রুষ্ট হয়ে ওঠে। চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেতে হবে কেন? এই লোকটার উপদ্রবের জন্য নমিতা এখানে বেড়াবার সাধ ছেড়ে দিয়ে ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে থাকবে কেন? উপদ্রবটাকে ভয় করবে কেন নমিতা?

না, ভয় করবে না নমিতা, সরেও যাবে না। এই ডাঙার যত আলোছায়া, বুনো ফুল আর পাখির ডাক এই লোকটার কেনা সম্পত্তি নয়। এই লোকটার অস্তিত্ব গ্রাহ্যই বা করবে কেন নমিতা? যদি হাঁ করে মুখের দিকে তাকায়, তবে তাকিয়ে থাকুক। একদিন ঝড়ের ধুলো নিজেই ওই চোখের উপরে ছিটকে পড়বে; আর চোখ ঘষে ঘষে সরে যেতে হবে।

কিন্তু না, সহ্য করতে পারা যাচ্ছে না; লোকটার উপদ্রব ক্রমেই বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠছে। জলস্রোতটার মাঝখানে ছোট একটা পাথরের উপর চুপ করে দাঁড়িয়েছিল নমিতা। হঠাৎ চমকে উঠতে হলো। ভদ্রলোক স্রোতের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন হঠাৎ একটা অভাবিত বিস্ময়ের মুখ দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ভদ্রলোক।

নমিতার মুখটা বিড়বিড় করে ওঠে, কি যেন বলতে চাইছে নমিতা। কিন্তু; আর কোন কথা না বলে, আর ভদ্রলোকের ছায়াটার দিকেও

কোন ভ্রূক্ষেপ না করে স্রোতের উপরের পর পর পাথরগুলির উপর পা রেখে রেখে স্রোত পার হয় নমিতা। ফিরে চলে যায়।

মনে হয় নমিতার, ভদ্রলোকও নিশ্চয় পিছু পিছু আসছে। নমিতার গম্ভীর মুখটা তাই আরও কঠোর হয়ে ওঠে। মনে মনে প্রতিজ্ঞাও করে নমিতা, ভদ্রলোক একটি কথা বললেই নিদারুণ কঠোর ভাষায় স্পষ্ট করে একটা অপমানের কথা বলে দেবে নমিতা।

কিন্তু আস্তে একটা হাঁপ ছাড়ে নমিতা। বুঝতে পারে, পিছু পিছু কেউ আসছে না। মুখ ফিরিয়ে দেখতে পায় নমিতা, ভদ্রলোক পা টিপে টিপে জলস্রোতটা পার হয়ে ওদিকে এগিয়ে চলেছে।

ছুটির একটা মাসের মধ্যে দশটা দিন পার হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র তিনটে দিন নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াতে পেরেছিল নমিতা। কিন্তু তারপরেই এই উপদ্রব। একটা দিনও বাদ যাচ্ছে না। এই উপদ্রব যে শেষ পর্যন্ত নমিতার নামে একটা মিথ্যে গল্প রটিয়ে ছাড়বে! পর পর তিনটে তিন যদি কারও চোখে পড়ে যে, এই বাড়ির একটি মেয়ে আর ওদিকের এক ভদ্রলোক রোজই এই নির্জন ডাঙাতে ঘুরে বেড়ায়; তবে তার মনে যে সন্দেহটা দেখা দেবে, সেটা কল্পনা করতে পারে নমিতা। যদি কাকিমারই চোখে পড়ে? কাকিমা কি একটু ভাবনায় পড়বে না? একটা বাজে ধারণাও কি করে ফেলবে না?

এক একবার ইচ্ছে হয়, শেফালি যে কাণ্ড করেছিল, ঠিক সেইরকম একটা কাণ্ড করে এই ভদ্রলোককে একটা শিক্ষা দিয়ে দিতে, একটু বুঝিয়ে দিতে। এভাবে চোরের মত আনাগোনা করে নমিতার মুখ দেখে কোন লাভ নেই। বৃথা আশা, বৃথা চেষ্টা। শেফালি এক ভদ্রলোককে এরকম কাণ্ড করতে দেখে একদিন বেশ স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিয়েছিল—ভুল করেছেন মশাই। এভাবে ভাব দেখাবার চেষ্টা করবেন না। আমার সঙ্গে যে মানুষটার ভাব-সাব আছে, তার তুলনায় আপনি একটি গরু না হলেও নিতান্ত গোবেচারা।

শেফালির কথা শুনে সেই লোকটা সেই-যে সরে পড়লো, তারপর আর কোনদিন শেফালিকে দেখবার জন্যে রাস্তার উপর এসে দাঁড়ায়নি।

যাই হোক, ইচ্ছে হলেও শেফালির মত অমন কটমটে ভাষায় শাসিয়ে দিতেও লজ্জা করে। সবচেয়ে ভাল হত, সৌম্যেন এই সময় যদি ছুটি নিয়ে একবার এখানে এসে পড়ত। তবে, এই ডাঙাতে সৌম্যেনের সঙ্গে যখন গল্প করে করে ঘুরে বেড়াতো নমিতা, তখন এই ভদ্রলোকের চোখ দুটো নিজেই শিক্ষা পেয়ে চমকে উঠত। নমিতার মুখের দিকে তাকাবার জন্য আর এদিকে ব্যস্তভাবে ছুটে আসতো না। সৌম্যেনকে দেখলেই বুঝতে পারত ভদ্রলোক, কোন্ মানুষের আশার জিনিসকে আশা করছে ভদ্রলোক! সৌম্যেনের তুলনায় এই ভদ্রলোক যে একটা গো-বেচারা, এই সত্য তখন চোখে দেখেই বুঝে ফেলতো ভদ্রলোক; উচিত শিক্ষা পেয়ে যেত।

কিন্তু, এই দশদিনের মধ্যে নমিতা যে ভদ্রলোকের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও করলো না, এটাও কি লক্ষ্য করতে পারেনি ভদ্রলোক? নমিতার চোখ যে লোকটার মুখের দিকে তাকাতে ঘেন্নায় কেঁপে ওঠে, এটাও কি লোকটা এখনও বুঝতে পারেনি? তাই তো মনে হয়। তা না হলে, লোকটার আশা আর ইচ্ছার সাহসটা দিন দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে কেন?

এই তো, আজই সকালে, আমলকী ঝোপটার এপাশে দাঁড়িয়ে যখন চুপ করে অনেক দূরের একটা শিমূলের লাল টকটকে মূর্তিটাকে দেখছিল নমিতা; ঠিক তখন কে যেন আমলকীর ঝোপের ওপাশে গুন্‌গুন্ করে গান গেয়ে উঠলো।

উঁকি দিয়ে দেখতে পায় নমিতা, সেই ভদ্রলোক একটা লতা থেকে রঙিন পাতা ছিঁড়ছেন আর গুন্‌গুন্ করে গান করছে।

না, আর উপায় নেই; এবার ছোটকাকাকে বলতেই হয় আর

ছোটকাকার পক্ষেও টাউনে গিয়ে পুলিশকে একটু বলে আসতে হয়! একটা জঘন্য মতলবের মানুষ রোজ এখানে ঘুরঘুর করে নমিতার বেড়াবার আনন্দ আর শান্তি নষ্ট করবে, এটা চলতে দেওয়া উচিত নয়।

কিংবা, এই লোকটাকেই বলে দিলে হয় যে, মশাই একটু সাবধান হয়ে যান; আমার পায়ে যে জুতো আছে, সেটা লক্ষ্য করতে ভুলে যাবেন না।

বলতে পারতো নমিতা, যদি লোকটা আর একটু সাহস করে ফেলতো, কোন কথা বলে ফেলতো।

হন্‌হন্‌ করে হেঁটে বাড়ি ফিরে যায় নমিতা। লোকটাকে সাংঘাতিক ধূর্ত বলে মনে হয়।

কিন্তু···কল্পনা করতে ভাল লাগে, লোকটাকে যদি সত্যিই, অত্যন্ত একটা নিদারুণ ঘৃণার কথা শুনিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারা যেত, তবে সৌম্যেনের কাছে গল্প করবার মত একটা ঘটনা পেয়ে যেত নমিতা। সৌম্যেন বোধহয় হেসে হেসে বলে ফেলতো তাহলে, তোমার উচিত ছিল নমিতা, কথা-টথা না বলে শুধু পায়ের এক পাটি শ্লিপার তুলে নিয়ে···।

উপদ্রবটার কাছে হার মানেনি নমিতা। ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। মাত্র আর একটি দিন আছে। তারপরেই এই স্থানের নিভৃতের আলোছায়া থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় চলে যেতে হবে। কিন্তু, একটা ব্যর্থ আক্রোশের জ্বালাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। এই অচেনা-অজানা লোকটার উপদ্রব চুপ করে সহ্যই করতে হয়েছে। লোকটা রোজই এসেছে। একই পথের উপর মুখোমুখি দুজনের দেখা হয়েছে। লোকটা প্রত্যেকটি সকালবেলার শোভাকে যেন একটা অস্বস্তিতে ভরে দিয়েছে।

কিন্তু আজ আর বোধহয় ক্ষমা করতে পারবে না নমিতা; কারণ, আজ আর সহ্য করা উচিত নয়। বিশ্রী মতলবের এই লোকটার মনটাও কী সাংঘাতিক ধূর্ত! ঠিক বুঝে ফেলেছে, আজই শেষ দেখার দিন; আর কালই চলে যাবে নমিতা। তা না হলে এত বড় একটা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে লোকটা নমিতার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?

সেই স্রোতের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল নমিতা। স্রোতটাকে যেখানে পার হতে হয়, ঠিক সেখানে; পা রাখবার প্রথম পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে আছে নমিতা।

আর এগিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না; শুধু এই স্রোতের কলকল শব্দের গান শুনে চলে যাবার জন্যই এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে নমিতা।

কিন্তু চমকে উঠতে হল। এ কি? লোকটা যে মস্তবড় একটা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে, যেন একটি ব্যাকুল অভ্যর্থনার ভঙ্গী ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার মনের একটা জঘন্য স্বপ্ন যেন এই কুড়িদিনের মধ্যে প্রচণ্ড দুঃসাহসী হয়ে বিশ্বাস করেই ফেলেছে যে, নমিতা ওর হাত থেকে ফুলের তোড়া তুলে নেবে।

তীব্র অথচ রুক্ষ স্বরে চাপা চিৎকারের মত উগ্র ভাষায় একটা ধমক হেনে কথা বলে নমিতা—অসভ্যতা করবার আর জায়গা পান নি?

চমকে ওঠে ভদ্রলোক—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ, এই পাথরটাকে বলছি না।

—আমাকে এ কথা বলছেন কেন?

—আপনি কোন্ সাহসে ফুল নিয়ে এসেছেন? আমি আপনার ফুল হাতে তুলে নেব, এমন বিশ্বাসের স্পর্ধা কোথায় পেলেন?

—আমি আপনাকে ফুল দিতে আসিনি।

—কি বললেন ?

—আপনি কোথা থেকে এমন সন্দেহ করবার স্পর্ধা পেলেন যে, আমি আপনার জন্যে ফুল নিয়ে এসেছি ?

—তবে আমার কাছে এসেছেন কেন ?

—এ ধারণাই বা হল কেন আপনার ? আপনার কাছে আমি আসিনি। আপনার কাছে আসবার কোন গরজও আমার থাকতে পারে না।

—কথার চালাকিতে রেহাই পেতে চেষ্টা করছেন।

—আপনার সঙ্গে কথা বলবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আপনি সরে যান।

কি বললেন ?

—হ্যাঁ, সরে যান। পাথরটা থেকে নেমে দাঁড়ান। পথ ছেড়ে দিন। আমি স্রোতটা পার হয়ে ওদিকে যাব।

—আপনি কি সেইজন্যে এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন ?

—আবার কথা বলছেন কেন ?

নমিতার চোখ জ্বলতে থাকে।—অপরাধ করে উল্টো অপমান করে কথা বলছেন।

—অপরাধ ?

—হ্যাঁ। আপনি দোষ ঢাকবার জন্য মিথ্যে কথা বলছেন।

—কিসের দোষ ?

—এই ফুল আমাকে দেবার মতলবে…।

—চুপ করুন। খুব খারাপ কথা বলছেন।

—তবে কি এ জঙ্গলটাকে ফুল উপহার দিতে যাচ্ছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেন ?

—ঐ জঙ্গলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন।

জঙ্গলটার দিকে তাকায় নমিতা। করবী আর কাঠগোলাপ ফুটে আছে। জঙ্গলের ঝোপঝাপ এক জায়গায় বেশ পরিষ্কার করা হয়েছে। আর ছোট্ট একটা সমাধি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ভদ্রলোক বলে—দেখতে পেলেন কিছু ?

নমিতা—হ্যাঁ, দেখছি তো একটা সমাধি। কিন্তু তাতে কি ?

ভদ্রলোক—ওটা আমার মায়ের সমাধি।

চমকে ওঠে নমিতা।

ভদ্রলোক—আমি প্রতিবছর এই সময় একবার আসি। আমার মায়ের সমাধিতে ফুল দিয়ে চলে যাই।

নমিতার বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাস যেন ভয় পেয়ে ধড়ফড় করতে থাকে।

ভদ্রলোক বলে—আজ আমার মায়ের মৃত্যুদিন। এই কদিন ধরে রোজই এসে সমাধিটাকে দেখেছি, কাঁটাগাছের ঝোপঝাপ সরিয়েছি। আজ ফুল দিয়ে চলে যাব। এর মধ্যে আপনাকে···।

নমিতার চোখ ছলছল করে।—থাক, আর কিছু বলবেন না।

ভদ্রলোকের মুখটাও এবার হঠাৎ একটু করুণ হয়ে যায়। যেন আনমনার মত কথা বলতে থাকেন ভদ্রলোক।—আজ বিশ বছর হল আমার মা মারা গিয়েছেন। আমরা তখন এই টাউনে থাকতাম। আমার বয়স তখন বোধ হয় দশ বছর। এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, এখানে একদিন বেড়াতে এসে মার কোলে মাথা রেখে আর শুয়ে পড়ে আমি ঘুঘুর ডাক শুনেছিলাম।

নমিতা বলে—আমাকে ক্ষমা করুন।

—না না, ক্ষমা করবার কোন কথা নেই। আমার মনে হয়, আপনি ভুল করে বোধ হয় মিথ্যে একটা সন্দেহ নিয়ে···।

নমিতার চোখ দুটো জলে ভরে যায়।—হ্যাঁ। ভুল করেছি।

ভদ্রলোক হেসে ওঠেন—বেশ তো, এখন তবে ভুলে যান।

ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন ভদ্রলোক।

নমিতা হঠাৎ বলে ওঠে—শুনুন।

—বলুন।

—আমাকে ফুলের তোড়ার অর্ধেকটা দিন।

—কেন ?

—আপনার মা'র সমাধিতে আমিও ফুল দেব।

—কেন ?

নমিতার ঝাপ্‌সা চোখ দুটো আরও ব্যাকুল হয়ে কেঁপে ওঠে।—তা না হলে মনে বড় বিশ্রী একটা অস্বস্তি, একটা অশান্তি থেকে যাবে।

—নিন তবে।

ফুলের তোড়াটা ভেঙে অর্ধেক ফুল নমিতার হাতে তুলে দেন ভদ্রলোক।

দু'জনে একসঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে এগিয়ে যায়। সমাধিটার কাছে দাঁড়ায়। ফুল রাখে। তারপর দু'জনে একসঙ্গেই মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে।

ঐশ্বরিক

তাঁর নাম সাধু রামানন্দ।

কানপুর থেকে আগে চিঠি লিখে নিরঞ্জনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ছোট কাকাঃ সাধু রামানন্দ এই একমাস এখানেই ছিলেন। এইবার পাটনা যাবেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছি, যেন পাটনাতে তোমাদের ওখানেই গিয়ে তিনি একবার পায়ের ধূলো দেন আর অন্তত একটা সপ্তাহ তোমাদের ওখানেই বিরাজ করেন। আশা করি তোমাদের ওখানে তাঁর সেবা-যত্নের আর ভক্তি-শ্রদ্ধার কোন ত্রুটি হবে না।

পাটনাতে এসেছেন সাধু রামানন্দ। এবং, একটা সপ্তাহ পারও হয়ে গিয়েছে, এখনও তিনি নিরঞ্জনের এই বাড়িতেই আছেন। আরও যে কতদিন এখানেই বিরাজ করবেন সাধু রামানন্দ, সেটা তিনিই জানেন। শিগগির যে চলে যাবেন, এমন কোন লক্ষণও তাঁর কথায় বা আচরণে দেখা যায় না।

ছোটকাকা এত আগ্রহ ক'রে আর অনুরোধ ক'রে চিঠি দিয়েছেন বলেই নিরঞ্জন চুপ ক'রে আছে; তা না হলে সাধু রামানন্দকে নিশ্চয় জিজ্ঞেস ক'রে বসতো নিরঞ্জন, আর কতদিন এখানে বিরাজ করবেন সাধুজী? কবে যাবেন?

বুঝতে পারা যায়; আর সাধু রামানন্দ নিজেও বলেছেন, কানপুরের ছোটকাকার বাড়িতে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা আর খুব সেবা-যত্ন পেয়েছেন সাধুজী। এখানে, নিরঞ্জনের এই বাড়িতে সাধুজীর সেবা-যত্নের অবশ্য কোন ত্রুটি হচ্ছে না; কিন্তু ভক্তি-শ্রদ্ধার কোন বাড়াবাড়ি নেই। ভক্তি-শ্রদ্ধার কোন ব্যাপার নেই বললেও চলে; যদিও অভক্তি বা অশ্রদ্ধার কোন ব্যাপার হয় না।

নিরঞ্জনের পাটনার বাড়ির পিছনের বাগানে বারান্দা-দেওয়া ছোট একটা ঘর আছে। পাকা ঘর। রঙীন সিমেণ্টের মেজে। এই রঙীন সিমেণ্টের চকচকে মেজের একদিকে সাধু রামানন্দের কম্বল পাতা আছে। একটা ঝোলা আছে। কমণ্ডলু আছে। এক জোড়া খড়ম আছে। কম্বলের উপর মাঝে-মাঝে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকেন সাধু রামানন্দ। তখন ঘরের ভিতরের আর বারান্দার ভিড়ও একেবারে নীরব হয়ে সাধুজীর সেই ধ্যানস্থ মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই ভিড়ের মধ্যে নিরঞ্জনকে কোন দিন দেখা যায় নি। নিরঞ্জনের বাড়ির কোন মানুষ এই ভক্ত-জনতার ভিতর এসে দাঁড়ায় না, বসে না, হাতজোড় ক'রে তাকিয়েও থাকে না।

অথচ নিরঞ্জনের বাড়িতে লোকজনের অভাব নেই। নিরঞ্জন আছে, নিরঞ্জনের স্ত্রী আছে; নিরঞ্জনের তিন বোন আছে; বড়দার যে দুই ছেলে কলেজে পড়ে, তারাও আছে। বড় বোন রাণুর বরও এখন এখানে আছে। এরা সবাই সাধু রামানন্দকে একবার দেখে গিয়েছে ঠিকই; কিন্তু শুধু দেখা; প্রণাম করেনি কেউ, হাত পেতে কোন আশীর্বাদী ফুলও চায় নি।

কিন্তু কোন তুচ্ছতার বা ঠাট্টার হাসিও হাসেনি কেউ। কানপুরে অনেক বড়-বড় লোকের বাড়িতে অনেক ভক্তি-শ্রদ্ধা পেয়েছেন এক সাধু, সে-সাধু দেখতে কেমন, শুধু এই কৌতূহলটুকুর জন্যই এবাড়ির মানুষেরা সাধুজীকে শুধু চোখে দেখেছে, আর চলে গিয়েছে।

কিন্তু সাধুজীর অসুবিধেও হতে দেয় নি নিরঞ্জন। বাইরের যারা আসছে আর ভিড় করছে—সাধুজীর ধ্যান দেখছে, উপদেশ শুনছে—তারা আসুক। দারোয়ানকে বলাই আছে, সাধুজীকে দেখবার জন্য কোন ভক্ত মানুষ এলেই যেন গেট খুলে দেওয়া হয়। রোজই সাধুজীর কিছু ফুল দরকার, কারণ বহু প্রার্থীকে আশীর্বাদ করতে হয়। নিরঞ্জন

তার চাকর কৈলাসকে বলে দিয়েছে, রোজ সকাল বেলা যেন এক ঠোঙা ফুল সাধুজীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

সাধুজীর ছ্'বেলার স্নানের জল কৈলাসই কুয়ো থেকে তুলে দেয়। বাড়ির রান্নার কাজ করে যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠ পাঁড়ে, তাকেও বলা আছে, সাধুজীর ছ্'বেলার ভোজন আর জলখাবার বাগানের ঐ ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবে। চা খাওয়া অভ্যেস আছে সাধুজীর। বৈকুণ্ঠ পাঁড়ে সকাল-সন্ধ্যায় সাধুজীর ঘরে চা পৌঁছে দিয়ে আসে।

সাধু রামানন্দের বয়স বেশি নয়; তবু মুখভরা দাড়ি, কাঁচা দাড়ি। জটা নেই, কিন্তু চুলই খুব লম্বা। চুলের গোছা মাথার উপরে ঝুঁটি ক'রে বাঁধা। পরনে গেরুয়া রঙে ছোপানো ধুতি আর ফতুয়া। গলায় তামার চাকতির একটা মালা; সে মালার সঙ্গে ছোট একটা সাদা শঙ্খ ঝুলছে।

নিরঞ্জন এক-একদিন রাণুর বর হিতেনের সঙ্গে গল্প করে—সাধুজীর আধ্যাত্মিক পসার তো বেশ জমে উঠেছে দেখছি।

হিতেন হাসে—তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

নিরঞ্জন—এ তো বড় চমৎকার প্রফেসন; পনর দিনের মধ্যেই মক্কেলের এত ভিড়। আমার চেম্বারে তো এই দশ বছরের মধ্যে একসঙ্গে দশজনের বেশি মানুষেরও ভিড় হয়নি।

হিতেন—সাধুজী ভক্তদের কাছ থেকে টাকা-পয়সাও নিচ্ছেন নাকি?

—নিচ্ছেন বই কি। আমারই মক্কেল শ্যামলাল আজ এক'শো টাকার একটি নোট দিয়ে সাধুজীকে প্রণাম করেছে।

হিতেন—তা হলে আমি আর এত কষ্ট ক'রে আর মড়া চিরে-চিরে ডাক্তারী পড়ি কেন? এরকম একটা স্পিরিচুয়্যাল প্র্যাকটিস শুরু ক'রে দিলেই তো পারি।

নিরঞ্জন হাসে—যদি সাহস করে শুরু করে দিতে পার তবে বুদ্ধি-মানেরই কাজ হবে হিতেন।

চাকর কৈলাস বলে—না বাবু; সকলেই যে সাধুজীকে টাকা দিয়ে প্রণাম করে, তা নয়। কেউ কেউ এক-আনা দু'-আনা দিয়েও প্রণাম করে। এমন কি, এক পয়সাও প্রণামী দিতে পারে না, এমন লোকও আসে।

হিতেন হাসে তার কাছ থেকে বোধহয় হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নেন সাধুজী।

কৈলাস -আজ্ঞে ?

হিতেন --নগদ না হলে, ধারেই পায়ের ধুলো বিক্রী করেন তোমাদের সাধুজী।

কৈলাস—না, জামাইবাবু। ঐ তো সত্যবাবুর বউ রোজই আসছেন আর প্রণাম ক'রে চলে যাচ্ছেন। কোন দিন একটা পয়সাও দেননি সত্যবাবুর বউ।

হিতেন --কেন ?

কৈলাস —পয়সা দেবার সামর্থ্য নেই।

দুই

ঠিকই, সাধু রামানন্দ বোধহয় মনে মনে রোজ বিরক্ত হয়েছেন। এক মহিলা ভক্ত রোজই আসছেন; দু'হাত জোড় ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসেও থাকছেন। সব ভক্ত চলে যাবার পরেও কিছুক্ষণ বসে থাকেন এই মহিলা।

সাধু রামানন্দের ধ্যানস্থ চোখ দুটোও মাঝে মাঝে যেন অস্বস্তি সহ্য করতে গিয়ে কাঁপতে থাকে।

সাধু রামানন্দ বিরক্ত হয়ে কথা বলেন—তুমি তো রোজই আস; কিন্তু একেবারে খালি হাতে আস কেন ?

—আমার যে একপয়সা দেবারও সামর্থ্য নেই, ঠাকুর।

—কেন? ভাত খাও না? সে জন্যে পয়সা খরচ করতে হয় না?

—ভাত খাই ঠাকুর; কিন্তু এক-একদিন খাইও না।

—কেন?

—স্বামী হলো রুগী, একবছর হলো বিছানা নিয়েছে। বাড়িওয়ালা এখনও দয়া ক'রে ঘরে থাকতে দিচ্ছে। আর, পাড়ার কেষ্টবাবু দয়া ক'রে বাড়ি থেকে ভাত পাঠিয়ে দেন বলেই...।

—তা হলে তো চলেই যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, বেঁচে আছি ঠিকই।

—তবে আর দুঃখ কিসের?

কেঁদে ফেলে সত্যবাবুর বউ—কিন্তু আমার ছেলেটা কি বাঁচবে ঠাকুর?

—কি হয়েছে ছেলের?

—কে জানে কি হয়েছে? গায়ে জ্বর, এই তিন মাসের মধ্যে ছেলে আমার একটা জিরজিরে কাঠি হয়ে গিয়েছে ঠাকুর। কি উপায় হবে ঠাকুর?

—ভগবানকে বল।

—আপনিই তো ভগবান। তাই তো আপনাকেই বলছি।

—কে বললে, আমি ভগবান?

—কেউ বলেনি, আমার মন বলছে। আমি স্বপ্ন দেখেছি, ঠাকুর।

হেসে ফেলেন সাধু রামানন্দ।

সত্যবাবুর বউ বলেন—ওরা কেউ আপনাকে চিনতে পারেনি; মনে করেছে, আপনি একজন মস্ত সাধু। কিন্তু আপনি যে সাক্ষাৎ ভগবান। আমি বুঝেছি, আমি চিনেছি, আপনি আর আমাকে ছলনা করবেন না, ঠাকুর।

সাধু রামানন্দের পায়ের কাছে চকচকে সিমেন্টের মেজের উপর মাথা লুটিয়ে দিয়ে কাঁদতে থাকে সত্যবাবুর বউ।

সাধু রামানন্দ--কিন্তু তুমি কি চাও, সেটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

সত্যবাবুর বউ—আপনি একবার নিজে গিয়ে আমার ছেলের কপালে আপনার পা ঠেকিয়ে আসবেন। আমি স্বপ্ন দেখেছি ঠাকুর, তা হলেই আমার ছেলের রোগ সেরে যাবে।

-ছেলেকে নিয়ে এস তবে।

--নিয়ে আসা সম্ভব নয়, ঠাকুর। ওকে একটু নাড়া দিলেই ওর প্রাণটা বের হয়ে যাবে বলে ভয় হয়। ছেলে আমার একমাস হলো একটু কাত হতেও পারে না, ঠাকুর।

সাধু রামানন্দের চোখ দুটো তীব্র হয়ে জ্বলতে থাকে।--আমি তোমার মর-মর ছেলের মাথায় পা ঠেকিয়ে দেবার পরেও যদি তোমার ছেলে ভাল না হয়, যদি তোমার ছেলে…।

—কি বলছেন ঠাকুর ?

যেন হিংস্র হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সাধু রামানন্দ—যদি তোমার ছেলে মরে যায় ? তবে ?

—তবে জানবো, আপনার তাই ইচ্ছে।

—আমার ইচ্ছে ?

—হ্যাঁ, ভগবান যা ইচ্ছে করবেন, তাই তো হবে। তাই তো মেনে নিতে হবে।

কী অদ্ভুত শান্ত নম্র আর অবিচল বিশ্বাসের এক নারী কথা বলছে। সাধু রামানন্দ এই ক'বছরের সাধুত্বের জীবনে কত শত ভক্ত ও ভক্তার বিশ্বাসের কথা শুনেছেন। কিন্তু এমন বিশ্বাসের কথা তো শোনেননি। ছেলে যদি মরে যায়, তবুও সাধু রামানন্দকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে মনে ক'রে রাখবে, এ কী ভয়ানক বিশ্বাস!

সত্যিই যে ভগবান হতে ইচ্ছে করে। অন্তত একদিনের জন্য ভগবান হয়ে এই মহিলার মর-মর ছেলের মাথায় পা ঠেকিয়ে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে ইচ্ছে করে। চেঁচিয়ে ওঠেন সাধু রামানন্দ—তুমি যাও।

—আমার কি উপায় হবে ঠাকুর?

—তুমি যাও। কোন কথা বলো না। তুমি আর এখানে এস না।

—ভগবান! সাধু রামানন্দের পায়ের কাছে মাথাটা নুইয়ে দিয়ে তার পর আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায় সত্যবাবুর বউ।

তিন

সন্ধ্যা হয়েছে। সাধু রামানন্দের চোখে আজ ধ্যান নেই। ঘরের ভিতরে কোন ভক্তও নেই।

আজ সকাল থেকে একটিও ভক্তের আগমন হয়নি। কাল মাত্র তিনজন এসেছিল। সাধু রামানন্দের আত্মাও যেন সতর্ক হয়ে উঠেছে। লক্ষণ ভাল নয়।

শুধু কাল নয়; গত দশদিন ধরে ভক্তের আগমন ক্রমেই বিরল হয়ে এসেছে। বুঝতে অসুবিধে নেই। ভক্তদের বিশ্বাসের জোয়ারে ভাঁটা পড়েছে। শ্যামলাল সেই মামলাতে জয়ী হতে পারেনি। আশীর্বাদী ফুল নিয়ে গেল যারা, তাদের একজনেরও চাকরি হয়নি। মুন্সীবাবুর জামাই শেষ পর্যন্ত মারাই গিয়েছেন, সাধু রামানন্দের আশীর্বাদী ফুলে কাজ হয়নি।

চাকর কৈলাসের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে সব খবর জানতে পেরেছেন সাধু রামানন্দ। কোন সন্দেহ নেই, এখানে আর পসার জমতে পারবে না। ঠিক এই সময়েই সরে যাওয়া নিয়ম। এইরকমই সময় বুঝে কানপুর থেকে সরে এখানে চলে এসেছিলেন সাধু রামানন্দ।

আজই, এই কিছুক্ষণ আগে ঝোলার ভিতর থেকে সব টাকা-পয়সা বের ক'রে আর গুণে নিয়ে, সেই সঞ্চয় একটা পুঁটলি ক'রে বেঁধে আবার ঝোলার ভেতরে রেখে দিয়েছেন সাধু রামানন্দ। কিন্তু আজই সরে পড়বার ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু না; আর দেরি করলে নিদারুণ ভুল করা হবে। ঐ যে, আজই বিকেলে এক ভদ্রলোক বাগানের ঐখানে দাঁড়িয়ে সাধু রামানন্দের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, কে সেই ভদ্রলোক? তাকে যে পাঁচ বছর আগে কলকাতার লালবাজার থানার সেই ঘরে একদিন দেখেছিলেন সাধু রামানন্দ। কী আশ্চর্য, সেই শিকারীর সন্ধান যে আজও ফুরোয়নি। আজও সেই হাতকড়ার প্রতিনিধি পৃথিবীর সব অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে এক তহবিল-তছরুপ মামলার আসামীকে ধরবার জন্য ছুটোছুটি করছে।

না, এক্ষুনি সরে পড়া চাই। কিন্তু...।

কোথায় যেন একটা বাধা। মনে হয়, ফটকের কাছে কলকাতার লালবাজারের সেই সাংঘাতিক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। হয়তো, তাঁর জামার বুকপকেটে ফেরারী আসামীর ফটোটা আছে। সাধু রামানন্দকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে আর এই লম্বা চুলের ঝুঁটি কেটে দিলে যে চেহারাটা বেরিয়ে পড়বে, সে চেহারার সঙ্গে ঐ ফটোর চেহারার যে কোন অমিল দেখতে পাওয়া যাবে না

না, ফটক দিয়ে বের হয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তা ছাড়া দারোয়ানও তো আশ্চর্য হয়ে বাধা দিতে পারে, এ কি; না বলে-কয়ে, বাবুকে কিছুই না জানিয়ে, এই সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনি ঝোলাঝুলি নিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছেন সাধুজী?

কিন্তু ও বাধার জন্য চিন্তা কিসের? ফটক দিয়ে বের হয়ে যাবার দরকার কি? এই তো পাঁচিলের কাছে একটা পেয়ারা গাছ আছে। গাছের গা বেয়ে পাঁচিলের উপর চড়ে তার পরেই টুপ্ ক'রে একটি

লাফ দিয়ে পিছনের গলিটাতে নেমে পড়তে পারা যায়। তারপর··· তারপর আর কে আটকাবে সাধু রামানন্দকে ? ট্রেনে না উঠে, নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে আর সারা রাত হেঁটে অনেকদূরের এক গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে গিয়ে আস্তানা নিতে পারা যাবে।

ওটা বাধা নয়। তবে কিসের বাধা ?

কৈলাস চাকরটার কাছ থেকে একটা ঠিকানা না নিয়ে সরে পড়তে পারছেন না সাধু রামানন্দ। সেই মহিলা, সেই সত্যবাবুর বউ; কোথায় থাকে সে ? কতদূর ? রাস্তাটার নাম কি ?

কৈলাস এসেছে। কৈলাসের হাতে একটা বালতি। বোধহয় স্নানের জল তুলে দিয়ে যাবে কৈলাস।

সাধু রামানন্দ জিজ্ঞাসা করেন--ঐ যে আসতো এক মহিলা, সত্য-বাবুর বউ, সে কোথায় থাকে বলতে পার ?

কৈলাস—হ্যাঁ, কদমকুয়ার শিবমন্দিরের পাশে একটা গলিতে সত্যবাবুর বাড়ি।

জল তুলতে চলে যায় কৈলাস। আর, ছটফট করতে থাকেন সাধু রামানন্দ। যেন ভয়ংকর একটা শখের জ্বালা সাধু রামানন্দের বুকের ভিতরে ছটফট করছে। সত্যিই ভগবান হতে ইচ্ছে করছে।

ধরা তো পড়তেই হবে একদিন। তাছাড়া, না ধরা পড়লেই বা কি ? চিরকাল এই পৃথিবীর আনাচে কানাচে শুধু সাধু রামানন্দ হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। ভগবান হবার সুখ কোন দিন কপালে জুটবে কিনা সন্দেহ।

স্নানের জল দিয়ে চলে গেল কৈলাস। আর এক মুহূর্তও দেরি করেন না সাধু রামানন্দ। ঝোলাটা হাতে নিয়ে, পেয়ারা গাছে চড়ে আর পাঁচিল টপকে গলির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যান।

চার

—ঠাকুর! এসেছেন ঠাকুর! ভগবান, তোমার এত দয়া! চেঁচিয়ে ওঠে সত্যবাবুর বউ।

—কিচ্ছু চিন্তা নেই। আমি আছি। শান্ত কোমল সান্ত্বনার স্বরে কথা বলেন সাধু রামানন্দ।

বিছানার উপর শুয়ে আছে, ধুক্‌ধুক্ করছে একটা শিশুর এইটুকু একটা বুক। হাত-পা সত্যিই যে জিরজিরে চারটে কাঠি। শুধু মুখটা একটু জীবন্ত। আর মুখটাও যে বড় চমৎকার। শিশুটার মাথায় রেশমের মত নরম ঝাঁকড়া চুল ফুরফুর ক'রে উড়ছে; জানালা দিয়ে ফুরফুর ক'রে বাতাস ঘরে ঢুকছে; তাই।

চোখ বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ে আছে ছেলেটা। সাধু রামানন্দ জিজ্ঞেস করেন —ঘুমিয়েছে বোধহয়।

—না ঠাকুর; বেহুঁস হয়ে আছে।

—কোন ভয় নেই। ভাল হয়ে যাবে।

—আপনি ওর মাথায় একবার পা ঠেকিয়ে দিন ঠাকুর।

বিছানার কাছে এগিয়ে যান সাধু রামানন্দ। ছেলেটার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন।

—দয়া করুন ঠাকুর। করুণ স্বরে মিনতি করে সত্যবাবুর বউ।

ছেলেটার ছোট্ট ছোট্ট পা দুটোকে আস্তে আস্তে হাতের উপর তুলে নিয়ে, তার পর সেই ছোট্ট পা দুটোর উপর ঝুঁটি-ওয়ালা মাথা ঘষে দিয়ে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে ওঠেন সাধু রামানন্দ—হ্যাঁ, দয়া কর! দয়া কর ভগবান!

তারপরেই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ান সাধু রামানন্দ। হেসে ফেলেন।—বাস্, এবার আমি যাই।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান সাধু রামানন্দ। তারপরেই হাতের

ঝোলাটাকে ঝুপ ক'রে মেজের উপর ফেলে দিয়ে সাধু রামানন্দ বলেন।—এর মধ্যে অনেক টাকা আছে। আজ এখনই সব চেয়ে বড় ডাক্তারকে ডেকে এনে ছেলেকে দেখাও। ভাল-ভাল ওষুধ খাওয়াও। ভাল ক'রে চিকিৎসা করাও।

আর কোন কথা না বলে দরজার দিকে এগিয়ে যান সাধু রামানন্দ।

পাশের ঘরের অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সত্যবাবুর বউ—ওগো, তুমিও একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ; ঠাকুর যে চলে যাচ্ছেন।

পাশের ঘরের অন্ধকারটা যেন ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠে।—দেখলাম! দেখলাম!

হেসে ওঠেন সাধু রামানন্দ—আমি চলি।

দরজার কাছে ঢিপ ক'রে মাথা ঠুকেই কেঁদে ফেলে সত্যবাবুর বউ।—ভগবান! ভগবান!

সুনিশ্চিতা

এই ট্রেনটা যাত্রা শুরু করে এখান থেকেই; তারপর গোমো হয়ে আর রামগড় হয়ে একেবারে ডিহরি-অন-শোন চলে যায়।

ধানবাদ রেল জংশনের নতুন প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটা। একটা ফার্স্ট ক্লাস, একটা সেকেণ্ড ক্লাস আর পাঁচটা থার্ড; সেই সঙ্গে গোটা দশেক গুড্‌স্ ওয়াগন। ছোট্ট এই ট্রেন গোমোতে গিয়ে বড় ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে যায়।

ছোট্ট এই গোমো লিঙ্ক এখনও স্তব্ধ। এঞ্জিনটা এখনও লাগেনি। সকাল আটটা পনেরোতে ছাড়বে, এখন তো মাত্র সাতটা। কিন্তু এরই মধ্যে এসে গিয়েছে বিমলেন্দু। আজকের সকালের আকাশটা যেমন প্রসন্ন আর উজ্জ্বল, বিমলেন্দুর মুখটাও তেমনই; আজকের সূর্যোদয়ের সব আভা যেন বিমলেন্দুর মুখের উপর লুটিয়ে পড়েছে। সাতটা দিন ডিহরি-অন-শোনে কাটিয়ে দিয়ে তারপর কলকাতা চলে যাবে বিমলেন্দু।

শীতের সকাল; তবু কুয়াশার ঘোর তেমন কিছু নেই। প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়েই দেখা যায়, মিনিটে মিনিটে এক একটা মোটরগাড়ি ছুটে এসে মোটর স্ট্যাণ্ডের কাছে থামছে। দিল্লী মেল বোধ হয় এখনই এসে পড়বে।

বিমলেন্দুর সব জিনিসপত্র কামরাতে তুলে দিয়ে যারা দাঁড়িয়েছিল, বিমলেন্দুর অফিসের দুই বেয়ারা আর কেরানী দত্তবাবু, তারা হয়তো দাঁড়িয়েই থাকতো; কিন্তু বিমলেন্দু বলে—আপনারা মিছিমিছি আর দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন দত্তবাবু? আপনারা যান।

আজ এখানে বিমলেন্দুর কাছাকাছি কেউ না থাকলেই ভাল।

একলা হয়ে থাকতে চাইছে বিমলেন্দু। আজ আর কিছুক্ষণ পরে, ট্রেনের এই ফার্স্ট ক্লাস কামরার সামনে প্ল্যাটফর্মের উপরে যে সুন্দর একটা উৎসব দেখা দেবে, সে উৎসবের সঙ্গে কেরানী দত্তবাবু আর বেয়ারাদের কোন সম্পর্ক নেই, কোন কাজও নেই।

থার্ড ক্লাস কামরাগুলি এরই মধ্যে যাত্রীতে ভরে গিয়েছে। সেকেণ্ড ক্লাস কামরাতে সস্ত্রীক এক বৃদ্ধ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব উঠে বসেছেন। আর এই ফার্স্ট ক্লাসে শুধু বিমলেন্দু। কিন্তু…ওটা আবার কেমন কামরা? ট্রেনটার শেষ প্রান্তে, গুড্‌স ওয়াগনগুলোরও শেষে, যেন ঝকঝকে তকতকে একটা সেলুন জোড়া লেগে রয়েছে। রেলওয়ের কোন ভি. আই. পি. যাচ্ছেন বোধহয়। সেলুনের সামনে প্ল্যাটফর্মের উপব বাক্স বেডিং ও বাস্কেটের একটা ভিড় জমে রয়েছে। আর দুটো বুল টেরিয়ারও আছে।

কিন্তু বুল টেরিয়ারের গলার শিকল শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে যে চাপরাসীটা, তার সাজ কোন রেলওয়ে কর্তাব চাপরাসীর সাজের মত নয়। খাকি চুস্ত পাজামা আর খাকি কোট, মাথায় একটা খাকি পাগড়ি; এই লোকটাকেও কোথায় যেন দেখেছে বিমলেন্দু।

মনে পড়েছে। লোকটা হলো ডি. কে. রায়ের চাপরাসী। এই তো সাতদিন আগে দেখতে পেয়েছিল বিমলেন্দু, ধানবাদ আদালতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উকিলের সঙ্গে কথা বলছেন ডি. কে. রায়; আর এই চাপরাসীটা কাগজপত্রের মস্তবড় একটা ফাইল হাতে নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বিমলেন্দু তার অফিসের কেরানী দত্তবাবুর কাছেই শুনেছে, ডি. কে. রায়ের বাবা হলেন এদিকের একজন কোল-কিং, কয়লা-রাজা। সুতরাং, ডি. কে. রায়কে কোল-প্রিন্স বলতে হয়। দেখতে সুন্দর, বয়স অল্প, আর এরই মধ্যে ব্যবসার কাজে এত দক্ষ; প্রিন্স বললে বাড়িয়ে বলা হয় না।

কিন্তু কোথায় চললেন ডি. কে. রায়? শুনেছিল বিমলেন্দু, নয়াবাদের কাছে ভজুয়া কোলিয়ারি নামে একটা কোলিয়ারির উপর ইনজাংশন জারি করবার জন্য এখানে এসেছিলেন ডি. কে. রায়। ইনজাংশন জারি করা বোধহয় হয়ে গিয়েছে। তাই চলে যাচ্ছেন ডি. কে. রায়, বোধহয় করনপুরার দিকে। ওদিকেও নাকি ডি. কে. রায়ের তুটো খাদ আছে।

হীরাপুরে মাত্র একটা মাস ছিলেন ডি. কে. রায়। হীরাপুরের জীবনের সঙ্গে ডি. কে. রায়ের কোন সম্পর্ক নেই। একটি মাসের মধ্যে কোন সম্পর্ক হতেও পারে না। দেখেছে বিমলেন্দু, খুবই সাধারণ রকমের চেহারার একটা বাংলোতে ভাড়াটে হয়ে শুধু একটা মাস হীরাপুরে কাটিয়েছেন ডি. কে. রায়। নিরিবিলি জায়গাতে একেবারে নীরব একটা বাড়ি। শুধু ঐ উকিলবাবু ছাড়া আর কাউকে কোনদিন ডি. কে. রায়ের নিরিবিলি বাংলোর ফটকে দেখতে পায়নি বিমলেন্দু।

কিন্তু বিমলেন্দুর সঙ্গে হীরাপুরের সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কটাই আর কিছুক্ষণ পরে এখানে একটা উৎসবের মত রূপ নিয়ে বিমলেন্দুর চোখের সামনে দেখা দেবে। আজ তুবছর হলো বিমলেন্দু হীরাপুরে আছে। বিমলেন্দুও হীরাপুরে একটি বাংলো ভাড়া নিয়ে তুটো বছর পার করেছে।

রঙীন ফুলে আর লতাপাতায়-ঘেরা একটি শৌখিন বাংলো। বিমলেন্দুর কাছে এই তু'বছরের জীবনটা যে একটা মায়াময় তৃপ্তির জীবন, একটা গৌরবের রেকর্ড, একটা গর্বের ইতিহাস।

ডি. কে. রায়ের বাংলো একটা মাস ধরে যেন হীরাপুরের তুচ্ছতার মধ্যে নিঝুম হয়ে দিন কাটিয়েছে; কিন্তু বিমলেন্দুর বাংলোর সে তুর্ভাগ্য হয়নি। ডি. কে. রায়ের বাংলোতে কোন ফুলই যে নেই; সুতরাং সেখানে ফুল নেবার আশায় কেউ ছুটে যেতে পারে

না। যায়ওনি কেউ। কিন্তু বিমলেন্দুর সেই বাংলোর ফুল নেবার জন্যে এই দু'বছর ধরে যেন একটা কাড়াকাড়ির উৎসব জেগে উঠেছিল।

কলকাতার যে কোম্পানির ইনস্পেকটিং অফিসার হয়ে বিমলেন্দুকে হীরাপুরে আসতে হয়েছে আর দুটো বছর থাকতে হয়েছে, সে কোম্পানির একটা ব্র্যাঞ্চ অফিস ধানবাদেও আছে। এটাও কয়লার এক কারবারী কোম্পানি। এ কোম্পানিরও তিনটে কোলিয়ারি ঝরিয়ার আশেপাশে আছে। আটশো টাকা মাইনে দেয় কোম্পানি, বাংলো-ভাড়া বাবদ আরও দু'শো টাকা। বিমলেন্দুর একা জীবনটাকে শৌখিন করে সাজিয়ে রাখতে পেরেছে বিমলেন্দু।

আপাতত এখানকার কাজের দায় চুকে গিয়েছে। এখন কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। হয়তো এক-আধ বছর পরে কোম্পানির কাজে আবার আসতে হবে। কিন্তু আপাতত হীরাপুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হচ্ছে।

বিমলেন্দুকে বিদায় দেবার জন্য যে উৎসব আর কিছুক্ষণ পরে এই প্ল্যাটফর্মের এখানে নবীন হাসি হাসবে, সেটা কিন্তু বিদায়ের সঙ্কেত হবে না। কোন সন্দেহ নেই, সেটা বিমলেন্দুর আশার জীবনে একটা আহ্বানের সঙ্কেত হয়ে ধরা দেবে।

মনে হয় শুধু ধীরাই আসবে। আর কেউ আসবে না। না এসে থাকতে পারবেই বা কেন ধীরা? এই দু'বছরে ধীরার দুটো জন্মদিনের উৎসবে যার হাত থেকে সবচেয়ে সুন্দর ফুলের তোড়া উপহার পেয়েছে ধীরা, তার হাতে আজ একটি ফুলের তোড়া তুলে দিতে ভুলে যাবে, এমন ভুলো মনের মেয়ে নয় ধীরা। ধীরার চোখ দুটো এই দুবছরে অন্তত দশবার বিমলেন্দুর মুখের দিকে নিবিড় হয়ে তাকিয়ে

বিমলেন্দুর প্রাণটাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে, কি আশা করছে ধীরা। ধীরাদের বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন খেয়ে চলে আসবার সময় নিজের কানেই শুনতে পেয়েছে বিমলেন্দু, ধীরার বাবা কার কাছে যেন বলছেন--চমৎকার ছেলে। বিমলেন্দুর মত যোগ্য ছেলে আমি আর দেখিনি।

সেই সন্ধ্যাটার কথাও কি ভোলা যায়? বাংলোর বারান্দায় আলো জ্বলছিল, এক মনে বই পড়ছিল বিমলেন্দু। হঠাৎ ফটকের একটা পাল্লা যেন মিষ্টি হাসির শব্দ ছড়িয়ে দুলে উঠলো।

ফটক খুলছে ধীরা। আর কী অদ্ভুত হাসি হাসছে! কী চমৎকার সেজেছে ধীরা!

—আসতে অনুমতি করুন, তা না হলে এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছি না। আষাঢ়ে ঝর্ণার মত উচ্ছল স্বরে কথা বলে হেসে উঠলো ধীরা।

- নির্ভয়ে আসুন।

কথাটা না বললেও চলতো। কারণ দেখাই যাচ্ছে, ধীরা একেবারে নির্ভয় হয়ে গিয়েছে। একাই এসেছে ধীরা।

বিমলেন্দু বলে---আমি জানতাম, আপনি হঠাৎ একদিন এখানে আসবেন।

ধীরা - কেমন করে জানলেন?

বিমলেন্দু--তা বলবো না। কিন্তু আপনি এবার বলুন।

ধীরা—কি বলবো?

বিমলেন্দু---আপনার ইচ্ছে ছিল কিনা, একদিন এখানে একা-একা এসে...।

ধীরার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ নিবিড় হয়ে যায়। ঠোঁটের ফুল্ল হাসিটাও যেন ফুল্ল অভিমানের মত কাঁপতে থাকে।—আমি তো আসবোই, যতদিন না আপনি বারণ করে দেন।

—ছিঃ, আমাকে কি আপনি একটা পাথর বলে ধারণা করেছেন ?

—করি না। তাই তো আসতে পারলাম। কিন্তু আর বেশিক্ষণ নয়। যে-কথা বলতে এসেছি, আজ শুধু সেটাই বলে দিয়ে চলে যাব।

—বলুন।

—কাল আমরা সবাই মিলে তোপচাঁচি লেকে বেড়াতে যাচ্ছি। আপনার কি সময় হবে ? যেতে পারবেন ?

বিমলেন্দু হাসে—যেতে যখন ইচ্ছে করছে, তখন সময় করে নিতেই হবে।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তোপচাঁচি লেকের আশে-পাশে বেড়িয়ে, জলের উপর পরেশনাথ পাহাড়ের গম্ভীর ছায়াটার দিকে তাকিয়ে ধীরা আর বিমলেন্দুর প্রাণ দুটো বিনা রাখীতেই এক হয়ে গিয়ে যেন একরকমের স্বপ্ন দেখেছিল।

ধীরা বলে—তোপচাঁচির লেকের কথা আর ক'দিন মনে করে রাখতে পারবেন ?

বিমলেন্দু—চিরকাল।

ধীরা বলে—চলুন এবার, সবাই এখন বোধহয় রওনা হবার জন্য তোড়জোড় করছে।

প্ল্যাটফর্মের উপর আস্তে-আস্তে পায়চারি করে বিমলেন্দু; চোখ দুটো কিন্তু মাঝে মাঝে ছটফট করে ওঠে। ধীরা কি একবার না এসে থাকতে পারবে ? অন্তত এটুকু জেনে নেবার জন্যেও তো আসবে, আর কতদিন পরে হীরাপুরে ফিরে আসবে বিমলেন্দু ? ধীরা যে অপেক্ষায় থাকবে, সে সত্যটা তো চোখ দুটোকে আর একবার নিবিড় করে দিয়ে আর বিমলেন্দুর মুখের দিকে শুধু নীরবে তাকিয়ে থেকেই জানিয়ে দিতে পারে ধীরা।

থার্ডক্লাসের কামরাগুলির ভেতরে ঠেলাঠেলি আর হুড়োহুড়ি বাড়ছে। চা-ওয়ালা চেঁচিয়ে হাঁক দিয়ে চলে যাচ্ছে।

এতক্ষণ ধরে শুধু ধীরার কথা ভাবলেও সন্দেহ হয় বিমলেন্দুর, হয়তো অতসীও আসবে।

হয়তো কেন? আসবেই অতসী। অতসী যে ধীরার মত অত সাবধানে আর হেঁয়ালি করে কথা বলে না। যা বলে তা স্পষ্ট করেই বলে দেয়। যা আশা করে তা একেবারে স্পষ্ট করেই আশা করে।

ধীরাদের সঙ্গে তোপচাঁচি লেক থেকে বেড়িয়ে এসে যখন বাংলোতে ফিরে বারান্দার উপর ক্লান্তভাবে বসে আর আলো নিভিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা-আকাশের তারা দেখছিল বিমলেন্দু, ঠিক তখন জোরে গলা কেশে আর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়েছিলেন এক ভদ্রলোক, অতসীব বাবা সনাতনবাবু।—বিমলেন্দু-বাবু আছেন?

সনাতনবাবু বলেছিলেন—অতসী নিজেই আসতো। কিন্তু একটু লজ্জা পাচ্ছে বলেই নিজে আর এল না; আমিই এলাম। আপনাকে কাল সন্ধ্যাতে কষ্ট করে আমার ওখানে একবার যেতেই হবে।

—কেন?

—অতসীর মা-র অনুরোধ, আমাদের বাড়ির সবারই অনুরোধ, আপনি অন্তত একটা ঘণ্টা আমার ওখানে বসে অতসীর গান শুনবেন, আর একেবারে খেয়ে-দেয়ে ফিরবেন।

বিমলেন্দু—নববর্ষের সম্মেলনে গান গাইলেন যিনি, তিনিই কি…।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অতসীই গান গেয়েছিল। তাহ'লে তো আপনি অতসীকে দেখেছেনও। যাই হোক, ইচ্ছে আছে আপনার পরিচয়টুকুও একটু ভাল করে জেনে নেব। আপনার বাবা আছেন নিশ্চয় ?

—আজ্ঞে না।

—মা ?

– না।

—অভিভাবক বলতে তাহলে…

—গুরুজন বলতে একজন আছেন।

—কে ?

—কাকিমা।

—তাহলেই হবে। মোটকথা, শুরুতে প্রস্তাবটা কোন গুরুজনের কাছেই করা নিয়ম। আচ্ছা, আমি আজ তবে আসি বিমলেন্দু।

বুঝতে অসুবিধে নেই। কত স্পষ্ট করে কোন্ ইচ্ছের কথা বলে চলে গেলেন সনাতনবাবু।

কিন্তু কাকিমাকে চিঠি লিখে বিশেষ কোন ফল হবে না। কাকিমা নিজেই একেবারে স্পষ্ট করে বিমলেন্দুকে জানিয়ে দিয়েছেন, নিজেই দেখে-শুনে পছন্দ করে নিয়ে তারপর একটা খবর দিস বিমল। আমাকে দিয়ে আর খোঁজাখুজি করাসনি। আমি পারবো না; তা ছাড়া আমার বুড়ো চোখের পছন্দের মেয়ে তোর মত ফ্যাশনের ছেলের চোখে ধরবে বলে মনে হয় না।

বিমলেন্দু হেসেছিল—পছন্দ যদি করি, তবে খবর পাবেন বৈকি। ঠিক সময়েই খবর দেব।

গান গাওয়া শেষ করেই অতসী হেসে উঠেছিল— বুঝতে পারছি, আপনার পছন্দ হলো না।

চমকে ওঠে বিমলেন্দু—কি বললেন ?

অতসী—আমার গানটা বোধহয় আপনার ভাল লাগলো না।

বিমলেন্দু—তাই বলুন।

অতসী হাসে—তাই তো বলেছি। আমাকে ভাল লাগলো কি না, এ প্রশ্ন তো করিনি।

একদিনেরও পরিচয় নয়; তবু কোন মেয়ে যে এরকম কথা এত স্পষ্ট করে বলে দিতে পারে, কখনও কল্পনাও করিতে পারেনি বিমলেন্দু। কিন্তু···মনে হচ্ছে, অতসী যেন বিমলেন্দুকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, অতসী দেখতে কত সুন্দর। অন্তত ধীরার চেয়ে অনেক সুন্দর। অতসীর স্পষ্ট কথাটা যেন স্পষ্ট একটা ঠাট্টা, বুঝিয়ে দিতে চায় বিমলেন্দুকে, অতসীকে ভাল লাগবে না, এমন সাধ্যি কারও হবে না; বিমলেন্দুরও না।

সাতটা দিনও পার হয়নি, অতসীও সে সন্ধ্যায় সেজেছিল; আর মিষ্টি সৌরভে যেন স্নান করে এসেছিল। আর নিজেদের গাড়িতেই এসেছিল।

একটা ফুলের তোড়া বিমলেন্দুর হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে হেসে ফেলেছিল অতসী।—স্বীকার করুন, এরকম চমৎকার ফুলের তোড়া আর কারও কাছ থেকে পান নি। এই প্রথম পেলেন।

বিমলেন্দু—চমৎকার অচমৎকার কোন ফুলের তোড়া পাইনি। আপনিই প্রথম দিলেন।

অতসী—প্রথম উপহারের মান রাখবেন।

বিমলেন্দু—নিশ্চয়। সেটা আপনার না বললেও চলতো।

অতসী যেন ছোট্ট একটা ভ্রূভঙ্গী করে তাকায়।—বলুন তো শুনি, কেমন করে মান রাখবেন?

—কি বললেন?

—বলতে চাইছেন, এর চেয়েও ভাল একটা ফুলের তোড়া আমাকে প্রতিদান দেবেন; এই তো?

অতসীর ভ্রূভঙ্গীটা যেন তীব্র একটা শ্লেষের অভিমানিত ভঙ্গী।

বোধহয় বলতে চাইছে অতসী; ওভাবে প্রতিদান সেরে দেওয়া যে একটা নিষ্ঠুরতা। অতসীর আশাকে এত সস্তা একটা ঘুষ দিলে সম্মানিত করা হবে না, অপমানিত করা হবে।

অফিস থেকে বাংলোতে ফেরবার পথে রোজই বিকালে অতসীর সঙ্গে একবার দেখা হয়েই যেত। ঠিক মুখোমুখি দেখা নয়; শুধু দুই চোখের চকিত দেখা। অফিসের গাড়িটা নিজেই চালিয়ে বাংলোতে ফিরতো বিমলেন্দু: ড্রাইভার পাশে বসে থাকতো। মোদি সাহেবের বাড়ির ফটক পার হয়ে রাস্তার বাঁকে এসে ডান দিকে ঘুরতেই দেখা যেত, রাস্তার দু'পাশের দু'সারির করঞ্জ পলাশ আর নিমের কোন একটি ছায়ার কাছে যেন আনমনা একটি রঙীন ছবি আস্তে আস্তে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোঁপাটা যেন চূড়ো করে বাঁধা; পায়ে নীল ভেলভেটের শ্লিপার, শাড়ির আঁচলটা বোধহয় একটু বেশি শিথিল আর বেশি লম্বা; তাই আঁচল দিয়ে কোমরটাকে শক্ত ক'রে এক ফেরতা জড়িয়ে নিয়ে যেন মৃদুলতার একটা ছন্দিত ভঙ্গী হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওরই নাম অতসী। বিমলেন্দুর গাড়ির স্পীড যদিও একটুও মন্থর না হয়ে অতসীর সেই মৃদুল সুন্দরতার মূর্তিটার পাশ কাটিয়ে ছুটে চলে যায়, তবু বিমলেন্দুর চোখের সেই চকিত চাহনির উপব অতসীর চোখের চাহনিও যেন চকিত ছোঁয়ার মত একবার শুধু তাকিয়ে নিয়েই আবার সরে যায়। করঞ্জের মাথার উপর বিকেলের রোদে কাকের ঝাঁক লাফালাফি করছে, একমনে যেন তাই দেখতে থাকে অতসী।

মনে হয়েছিল, ঠিকই, এ শুধু চকিত ঘটনার দেখা। নিতান্ত আকস্মিকের খেলা। এই সময়টা অতসীর বেড়াতে বের হবার সময়, আর বিমলেন্দুর অফিস থেকে বাংলোতে ফেরবার সময়। কাজেই, এ দেখা নিতান্তই দুটি ঘটনার যোগফল। কিন্তু···এখনও সেদিনের স্মৃতি বিমলেন্দুর মনের এক কোণে যেন ঝলমল করছে। সেদিন

বাংলোতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, সন্ধ্যারও অনেক পরে, রাত নটাও পার হয়ে গিয়েছিল, শীতের কুয়াশাতে মোদি সাহেবের এত বড় বাড়িটাও ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। বিমলেন্দুর গাড়িটা রাস্তার বাঁকে এসে একটু মন্থর হয়ে ডাইনে ঘুরতেই যেন আরও মন্থর হয়ে গেল। আর একটু হলে ব্রেক কষে গাড়িটাকে বোধহয় একবারে স্তব্ধ করেই দিত বিমলেন্দু। নীল ফ্ল্যানেলের ওভারকোট গায়ে আর গলায় একটা পশমী মাফলার জড়ানো, অতসী একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে, যেন আজকের কুয়াশার একটা বেদনার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ির গতি আরও মন্থর করে দিয়ে কথা বলে বিমলেন্দু—এ কি? আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?

কি অদ্ভুত একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে অতসীর চোখে। বিমলেন্দুর পাশে ড্রাইভার বসে আছে; দেখতে পেয়েও অতসী যেন কুয়াশাভরা রাতটাকে একটা নির্জন জগতের রাত বলে মনে করেছে। যেন জোর করে হাসতে চেষ্টা করে অতসী। মনে হয়, অতসীর ঐ অদ্ভুত ভ্রূকুটি যেন একটা অভিমান চাপা দেবার জন্য হাসতে চেষ্টা করছে। অতসী বলে—একজনকে দেখবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

বিমলেন্দু হাসে—দেখা পেলেন?

অতসী—জানি না।

অতসীদের বাড়িটা এখান থেকে দূরে নয়; ঐ তো, যে-বাড়িটার জানালার পর্দার রং লাল হয়ে কুয়াশার মধ্যে ফুটে রয়েছে, সেটাই অতসীদের বাড়ি।

বিমলেন্দু বলে—চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

অতসী—তবে গাড়ি থেকে নামুন।

—কেন?

—গাড়ি চড়বার গরজ আমার নেই।

—বাড়ি যাবার গরজ তো আছে ?

—আছে।

গাড়ি থেকে নামে বিমলেন্দু। ড্রাইভার গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে চলে যায়। কুয়াশায় ভরা রাতটা এখন সত্যিই একটা নির্জনতার জগতের রাত। এখানে বিমলেন্দু আর অতসী ছাড়া আর কেউ নেই।

বিমলেন্দু বলে—আজ অফিসে অনেক কাজ ছিল। যাই হোক, আসবার সময় একটা কথা বারবার মনে হচ্ছিল।

অতসী—কি ?

বিমলেন্দু—মনে হচ্ছিল আজ আর আপনাকে দেখতে পাওয়া যাবে না।

—কেন ?

—রাত নটা হয়ে গেছে ; এ সময় তো কেউ বিকেলের হাওয়া খাওয়ার জন্যে বেড়াতে বের হয় না।

—আমি বিকেলের হাওয়ার জন্য বেড়াতে বের হই না। রাতের কুয়াশার জন্যেও না।

—তবে ?

—জিজ্ঞেস করবেন না।

অতসীদের বাড়ির গেটের কাছে এসে পড়েছে বিমলেন্দু আর অতসী। এখানেও রাতের অন্ধকার আছে, কুয়াশা আছে ; তবু বিমলেন্দু যেন অতসীর চোখ ছুটোকে স্পষ্ট দেখতে পায়। বিমলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে অতসীর চোখের তারা ছুটো যেন ছুটো ব্যাকুলতার তারার মত ঝিকঝিক করছে।

বিমলেন্দু বলে—আসি তবে।

অতসী—আস্থন।

সেই অতসী কি আজ একবার এখানে এসে দেখা দিয়ে যাবে না ? অতসী তো জানে, আজ সকাল আটটায় ট্রেন ছেড়ে যাবে। অতসীদের

বাড়িতে গিয়ে সনাতনবাবুর সঙ্গে দেখা করে বিমলেন্দু তার হীরাপুরের জীবন থেকে বিদায় নেবার দুঃখটাকে জানিয়ে এসেছে।—কাল সকাল আটটায় হীরাপুর থেকে শুধু আমিই বিদায় নেব, কিন্তু আমার মনটা এখানেই পড়ে থাকবে।

না, ধীরা না আসুক, অতসী আসবে। ধীরা বোধহয় ভুল করে সবই ভুলে গেল। কিংবা, হয়তো ধীরার কপালের সেই একপেশে ব্যথাটা বেড়েছে, আর কপালে অডিকলোনের পটি লাগিয়ে একেবারে নিঝুম হয়ে ঘরে বসে আছে ধীরা!

যাই হোক, অতসীর তো না আসবার কোন কারণ থাকতে পারে না। হতে পারে, অতসীদের গাড়িটা আজ হঠাৎ খারাপ যছে। কিংবা ড্রাইভার আসেনি। কিংবা সনাতনবাবু হয়তো হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কে জানে এমন কোন্ ঘটনার বাধা দেখা দিয়েছে, যে জন্যে এখনও এখানে পৌঁছে যেতে পারলো না অতসী?

হীরাপুরের দু'বছরের জীবনের ঘটনাগুলি যেন একটা একটানা উৎসবের মত ঘটনা। আসবার আগে কোন সুস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি বিমলেন্দু, এখানে এসে এরকম এক-একটি প্রীতির আর আকুলতার লক্ষ্য হয়ে উঠবে বিমলেন্দু। হীরাপুরে এসে বিমলেন্দু যেন তার আত্মাটার গৌরব দু'চোখে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। দেখিয়ে দিল ধীরা, দেখিয়ে দিল অতসী, দেখিয়ে দিল...হ্যাঁ, সুমনা কি জানে না যে, আজ হীরাপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে বিমলেন্দু? জানে বইকি, মাসখানেক আগে যে নিজের হাতে চিঠি লিখে সুমনাকে জানিয়েছে বিমলেন্দু—আর একটি মাস পরে আমার 'স্বর্গ হতে বিদায়' নেবার লগ্নটি দেখা দিবে। আপনি বোধহয় শুনেছেন, এখন আপাতত আমাকে কলকাতার অফিসে ফিরে যেতে হবে।

হীরাপুরের দু'বছরের জীবনে মাঝে মাঝে শুধু একটি যে ঘটনা বিমলেন্দুকে বিরক্ত করেছে, সে-ঘটনার স্মৃতি মনের ভেতরে থাকলেও,

সে স্মৃতিটাকে একটুও পছন্দ করে না বিমলেন্দু। তবু হঠাৎ মনে পড়ে যায়, কিন্তু একটুও আশ্চর্য বোধ করে না বিমলেন্দু। নিখিল সরকারের মত স্বার্থের মানুষ আজ এখানে এসে একবার দেখা দিয়ে যাবে, এটা কল্পনা করাই ভুল। লোকটার দরকার ছিল টাকা, বিমলেন্দুকে তাগিদ দিয়ে উত্যক্ত করেছে, সাহায্য পেয়েছে আর চলে গিয়েছে লোকটা। বাস্, তার কাজ হয়ে গেছে।

লোকটা নাকি ধানবাদ বাজারের একটা জুতোর দোকানে কেরানীর কাজ করে। লোকটা যেন বছরের বারো মাস বারো রকমের অভাব আর টানাটানির জ্বালায় ভুগছে।

—আপনি বারবার আমার কাছে এভাবে যখন-তখন সাহায্য চাইতে আসবেন না। স্পষ্ট করে একদিন বলেই দিয়েছিল বিমলেন্দু।

বার বার মানে অবশ্য তিন বার। প্রথম এসেছিল নিখিল সরকার, বিমলেন্দুর অফিসের বারান্দার সিঁড়ির উপর সারাবেলা দাঁড়িয়েছিল, আর বিমলেন্দুকে দেখতে পেয়েই আবেদন করেছিল—যদি কিছু না মনে করেন তবে, তবে আপনাকে একটু বিরক্ত করতে চাই।

বিমলেন্দু—বিরক্ত করুন তাহলে।

—আমার মেয়ে এই বছর প্রাইভেট আই-এ দেবে।

—আপনি কি করেন ?

—আমি বোম্বে শু স্টোর্সে খাতা লিখি।

—বোম্বেতে ?

—আজ্ঞে না, এখানে এই ধানবাদ বাজারে।

—ভাল কথা, আসুন তাহলে, আমি একটুও বিরক্ত হইনি।

—আজ্ঞে, কথাটা হলো, মেয়েটার জন্য কিছু বই কেনা দরকার। গোটা পঞ্চাশ টাকা পেলে…

—তাই বলুন।

পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিল বিমলেন্দু। কিন্তু, কোন সন্দেহ নেই যে, বিমলেন্দুর মনটা খুবই অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছিল। নিখিলবাবু নামে এই লোকটা যেন অদৃষ্টের একটা দুর্গতির ছবি দেখিয়ে দিয়ে গেল। দেখতে একটুও ভাল লাগে না। শুনতে খুবই খারাপ লাগে। নিখিলবাবু যেন জীবনের যত রঙীন হাসি আর কলরবের, যত রঙ আর আলোর, যত ফুল আর ফলের, যত জ্যোৎস্না আর ফুরফুরে হাওয়ার একটা ভয়াল প্রতিবাদ। যেন পৃথিবীর সুখী মানুষের মনের কাছে নিষ্ঠুর একটা ঠাট্টাকে শব্দ করে শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, আজ তুমি অফিসার হয়ে গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছ, কাল তুমি জুতোর দোকানের কেরানী হয়ে যেতে পার, তখন মেয়ের বইয়ের জন্য পরের কাছে হাত পাততে যে একটু লজ্জাবোধও করবে না।

মাস তিন-চার পরে আর একবার এসেছিল নিখিল সরকার।—আবার আপনাকে বিরক্ত না করে পারলাম না।

বিমলেন্দু—এবার আমি সত্যিই বিরক্ত হব।

নিখিল সরকার—মেয়েটার পরীক্ষার ফী-এর জন্য আরও ষাট-টা টাকা না পেলে যে চলবে না স্যার। অনেক চেষ্টা করেও জোগাড় করতে পারলাম না। এখন আপনি যদি দয়া করে…।

ষাট টাকা নিখিল সরকারের হাতে তুলে দিয়ে বিমলেন্দু বলে—কিন্তু…একটা কথা শুনুন। আর আমাকে বিরক্ত করবেন না।

কিন্তু আবার একদিন এলেন নিখিল সরকার।—পরীক্ষা দিতে মেয়েটাকে পাটনা যেতে হবে স্যার। কিছু টাকা দরকার। অন্তত চল্লিশটা টাকা পেলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।

—না, আর টাকা দিতে পারবো না।

চলেই যাচ্ছিল নিখিল সরকার। বিমলেন্দু বলে—দেখুন। এবারও

টাকা দিচ্ছি, কিন্তু একটি শর্তে। আর আপনি কক্ষনো টাকা চাইতে আসবেন না।

—যে আজ্ঞে, আর কক্ষনো আসবো না।

সেদিন টাকা নিয়ে চলে গেল যে লোকটা, সে লোকটা কি সত্যিই শোনেনি যে বিমলেন্দু আজ চলে যাবে? কালই তো অফিসঘরের কাজের মধ্যে জানালার দিকে একবার চোখ পড়তেই দেখতে পেয়েছিল বিমলেন্দু, নিখিল সরকার নামে সেই লোকটা ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে। ড্রাইভার নিশ্চয় বলে দিয়েছে—না, আজ আর দেখা হবে না; সাহেব খুব ব্যস্ত। কালই কলকাতায় চলে যাচ্ছেন সাহেব

আজ এখানে এসে কোন স্বার্থের দাবির কথা নিয়ে বিমলেন্দুকে বিরক্ত করে যাবে, নিখিল সরকার নামে সে লোকটার মনে সে-কৃতজ্ঞতাটুকুও নেই। ওদের স্বভাবটা স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। যেই বুঝেছে যে বিরক্ত করে আর কোন ফল হবে না, টাকা পাওয়া যাবে না, অমনি সাবধান হয়ে গিয়েছে: আর, সব উপকারের কথা ভুলেও গিয়েছে।

কিন্তু সুমনা ভুলে যাবে কেন? সুমনা যে দেখে ধন্য হয়ে গিয়েছিল, বিমলেন্দু তার সেই উপহার, একজোড়া লাল গোলাপকে ব্যস্তভাবে তুলে নিয়ে নিজের বুকের ওপরে, তার মানে, জামার বুক-পকেটের কাছে পিন দিয়ে এঁটে দিয়েই হেসে উঠেছিল।—আমার সকল কাঁটা ধন্য করে…।

সুমনাদের বাড়িতেও অন্তত চারবার চায়ের উৎসবে নিমন্ত্রণ পেয়েছে বিমলেন্দু। চায়ের আসরে এত লোক থাকতে বেছে বেছে বিমলেন্দুরই চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সুমনা। এত লোক থাকতে শুধু বিমলেন্দুর সঙ্গেই কথা বলেছিল সুমনা। সুমনার জ্যাঠামশাই শশধরবাবু সেদিন মল্লিক সাহেবকে যে-কথাটা বলেছিলেন, সে-কথাটা

স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল বিমলেন্দু। কোন সন্দেহ নেই মিস্টার মল্লিক, বিমলেন্দু একটি আইডিয়্যাল ছেলে

কোন সন্দেহ নেই, সুমনার স্বপ্নেরও আইডিয়্যাল মানুষ বিমলেন্দু। সুমনা নিজের মুখেই একদিন বিমলেন্দুর কাছে কথাটা বলেছে—আপনি যতদিন হীরাপুরে আছেন, আমিও হীরাপুরে ততদিন। আপনি যদি চলে যান…।

—কি

—আমিও তবে চলে যাব।

—কোথায় ?

—দার্জিলিং-এ কাকার কাছে।

—কেন ?

—কোন্ লজ্জায় এখানে আর পড়ে থাকবো ? মানুষের চোখে একটা ঠাট্টার বস্তু হয়ে পড়ে থাকার জন্যে ?

—কিন্তু আমি যদি হঠাৎ দার্জিলিং-এ গিয়ে আশ্রয় নিই, তবে ?

—বাড়িয়ে বলবেন না। এত সৌভাগ্য আমার হবে না।

তাই তো মনে হয়, আর কেউ না আসুক, অন্তত সুমনা আজ একবার এখানে না এসে পারবে না। শশধরবাবুর সেদিনের কথাটার ঝঙ্কার যে এখনো বুকের ভিতরে শুনতে পাচ্ছে বিমলেন্দু—আইডিয়্যাল ছেলে। সুমনার চোখের নীরব সঙ্কেতও কতবার জানিয়ে দিয়েছে, বিমলেন্দু যে সুমনার আশার জগতে একটা আনন্দের ঝঙ্কার হয়ে গিয়েছে। সুমনার যত প্রিয় উপন্যাস, যত হার্ডি থ্যাকারে আর জর্জ এলিঅট একটি-একটি করে নিজেই বিমলেন্দুর বাংলোতে এসে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে সুমনা। বই ফেরত নেবার জন্যও আবার নিজেই এসেছে।

বিমলেন্দু আশ্চর্য হয়ে বলেছে--আপনি একটুও বিরক্ত বোধ করছেন না, এটাই আশ্চর্য

—কিসের বিরক্ত ?

—এই যে, এত খাটছেন। বই দিয়ে যাচ্ছেন, বই নিয়ে যাচ্ছেন।

—বলুন, আপনি বিরক্তি বোধ করছেন।

—চমৎকার বিরক্তি।

—ঠাট্টা করছেন ?

—কক্ষনো না।

—চিরকাল বিরক্ত করবো না, দুশ্চিন্তা করবেন না।

—চিরকাল বিরক্ত হতেই যে চাই।

সুমনা বলে—আস্তে কথা বলুন। পল্টু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। এত ছেলেমানুষ নয় পল্টু যে, আপনার ভাষার মানেটাকে সন্দেহ করতে পারবে না।

—আপনি সন্দেহ করবেন না তো ?

—আপনি যদি বলেন, তবে নিশ্চয় সন্দেহ করবো না।

—বলছি, সন্দেহ করবার কিছু নেই।

নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছিল যে-সুমনার আশা, সে-সুমনা আজ আসবে না, এ সন্দেহটাকে যে সহ্য করতে ইচ্ছে করে না। নিতান্ত অর্থহীন সন্দেহ। আসবে বইকি। এখনও অনেক সময় আছে। ট্রেনের গায়ে এঞ্জিন এখনও লাগেনি। হতে পারে ওরা তিনজনে একসঙ্গেই আসবে—ধীরা, অতসী আর সুমনা।

ট্রেনের ঐ প্রান্তে, সেলুনের দরজার কাছে একটা ব্যস্ততা। ডি. কে. রায়ের জিনিসপত্র কামরায় উঠছে। আর ডি. কে. রায় নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছেন, বুল টেরিয়ারের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে হাসছেন।

গার্ডের মূর্তি দেখা দিয়েছে। পার্শেল ভ্যানের কাছে দাঁড়িয়ে কি-যেন দেখছেন গার্ড।

এঞ্জিন লেগেছে! প্ল্যাটফর্মের শোরগোল এবার বেশ একটু উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

আর, ও কি ব্যাপার? একগাদা মুখর হাসির উৎসব ওখানে, ঠিক ডি. কে, রায়ের সেলুনের কাছে যে উদ্দাম হয়ে উঠেছে? হাসি, ফুল আর রঙীনতার হিল্লোল। ধীরার হাতে ফুল, অতসীর হাতে ফুল, সুমনার হাতে ফুল। আর ডি. কে. রায় সেই অভ্যর্থন্যর উল্লাসের সামনে এক পরম বরেণ্য মূর্তির মত দাঁড়িয়ে হাসছেন। হাসছে হীরাপুরের এক হৃদয়েশ্বরের জয়ন্ত মূর্তি।

বিমলেন্দুর চোখ দুটো অপলক হয়ে শুধু দেখছে; কান দুটো যেন হিমাক্ত হয়েও শুধু শুনছে। তিনটি রঙীন আশার ব্যাকুলতা যেন প্রাণদানের জন্য ডি. কে. রায়ের মুখের সেই প্রসন্ন হাসির কাছে হুড়োহুড়ি করছে। কখন এল ওরা? একে-একে এসেছে, না একসঙ্গে? কিন্তু এলই যদি তবে ওখানে কেন? কিছুই বোধ-হয় বুঝতে পারছে না বিমলেন্দু। ট্রেনের এদিকে একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরা, আর ওদিকে একটি শৌখীন সেলুন -এদিকে এক কোল-কোম্পানির একটি ভৃত্য, আর ওদিকে যে স্বয়ং একটি কোল কোম্পানি—মাঝখানে যে বিপুল একটা ব্যবধান -- বুঝতে পারছে না কেন বিমলেন্দু? তাই ভাবতে গিয়ে বার বার চমকে উঠছে বিমলেন্দুর হৃৎপিণ্ডটা; প্রশ্নটা বোবা যন্ত্রণায় ছটফট করছে—কেন? কেন ধীরা, অতসী আর সুমনা ওখানে গিয়ে একেবারে পুষ্পিত উৎসর্গের মত লুটিয়ে পড়েছে? কবে ওদের সঙ্গে ডি. কে. রায়ের দেখা সাক্ষাৎ হলো? ডি. কে রায়ের নীরব বাংলোটাকে যে অতিতুচ্ছ একটা শূন্যতার বাংলো বলে মনে হতো। ফুলের একটা টবও যে

সেই বাংলোর বারান্দাতে ছিল না। সেই মানুষের কাছে আজ এত ফুল ব্যাকুল হয়ে তুলতে শুরু করলো কেন?

বিমলেন্দুর অবুঝ হৃৎপিণ্ডটা বোধহয় নিঝুম হয়ে গিয়েছে। আর ওদিকে না তাকিয়ে যেন একটা ভয়ানক আহত অথচ ভয়ানক অলস মানুষের মত আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে নেয় বিমলেন্দু; মাথা হেঁট করে প্ল্যাটফর্মের উপর পড়ে-থাকা একটা রুমালের দিকে তাকিয়ে থাকে। রুমালটাতে কুমকুমের দাগ লেগে রয়েছে। কে জানে কোন্ তরুণীর মন ভুল করে কিংবা হয়তো ইচ্ছে করেই তার কপালের কুমকুমের স্মৃতিটাকে এভাবে ধুলোর ওপর ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে।

যাক্, ওদিকে আর তাকাবার কোন মানে হয় না। বিমলেন্দু যে-রকমের ভ্রমর, ওরাও সে-রকমের ফুল। ভালই হয়েছে। বিষে বিষক্ষয় হয়ে গেল। চমকে ওঠে বিমলেন্দু। ছোট্ট একটা ছেলের কণ্ঠস্বর।—আমরা এসেছি।

বিমলেন্দু—কে? তুমি কে?

—বাবা কাল হাজারিবাগ গিয়েছেন, তাই আমরা এলাম।

—কে তোমার বাবা?

—নিখিলনাথ সরকার।

—অ্যাঁ?

—মা আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। বাবা থাকলে বাবা নিজেই আসতেন।

—কেন

—আপনার জন্য খাবার তৈরি করে দিয়েছেন মা।

কিন্তু কই? ছেলেটার হাতে তো কোন খাবারের ঠোঙা-টোঙা নেই। হ্যাঁ, ল্যাম্প-পোস্টটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে যে, তার হাতে সত্যিই যে ছোট্ট একটা খাবারের হাঁড়ি; বড় একটা রুমাল দিয়ে বাঁধা।

ছেলেটা বলে—আমি আর আমার দিদি এসেছি।

এইবার ছেলেটার দিদিই এগিয়ে এসে, একটা লজ্জাভীরু খুশির মূর্তির মত যেন ভয়ে-ভয়ে হেসে কথা বলে—আপনি চলে যাচ্ছেন শুনে আপনাকে জানাতে এলাম···।

বিমলেন্দু—কি ?

—আমি পাস করেছি। মা বললেন, খবরটা আপনাকে দেওয়া উচিত।

—কেন ?

—আপনি সাহায্য করেছিলেন বলেই তো···।

বিমলেন্দুর চোখ দুটো চমকে ওঠে ; যেন বুকের ভিতর থেকে একটা বিস্ময় উথলে উঠে দুচোখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। বিমলেন্দু হাসে—বুঝলাম, আপনারা দুজন হলেন নিখিলবাবুর মেয়ে আর ছেলে। অর্থাৎ, দিদি আর ভাই ; কিন্তু দিদির নামটাই বা কি আর ভাইটির নামটাই বা কি ?

—আমি মীরা, ভাই হলো বলাই।

—বেশ ; দিন তাহলে, কি খাবার এনেছেন।

মীরার হাত থেকে খাবারের হাঁড়িটা তুলে নিয়ে কামরার ভিতরে রেখে আসে বিমলেন্দু।—আচ্ছা, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল হলো। নিখিলবাবুকে আমার নমস্কার জানাবেন।

কী অদ্ভুত কাণ্ড! নিখিলবাবুর মেয়ের চোখ দুটো যেন হঠাৎ জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়ে অদ্ভুত রকমের হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণ বিমলেন্দুর মুখের দিকে তাকাতে যে-মেয়ের চোখ দুটো ভীরু ফুলের কুঁড়ির মত গুটিয়ে একেবারে এইটুকু হয়ে গিয়েছিল, সেই চোখ দুটোই যেন নতুন বাতাসের সাড়া পেয়ে ফুটে উঠেছে, টানা-টানা সুন্দর একজোড়া কালো চোখ।

নিখিলবাবুর মেয়ের বয়স কত হবে ? ধীরা, অতসী কিংবা সুমনার

চেয়ে বড়-জোর এক-দুই বছরের ছোট হবে। এমন কিছু ছোট নয়। তবে তার চোখে এত ভীরুতা কেন? আর হঠাৎ এত বেশি বিস্ময়ই বা কেন?

বিমলেন্দু বলে—আই-এ পাস তো করলেন। তারপর? বি. এ. পড়বেন নিশ্চয়।

—না।

—কেন?

উত্তর দেয় না মীরা। আজ মীরার এই নিরুত্তর মূর্তিটার দিকে তাকাতে গিয়ে বিমলেন্দুর চোখ দুটো যেন লোভীর মত অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মীরার পায়ে রবারের চটি, তাও এক জায়গায় কেমন ছেঁড়া-ছেঁড়া বলে মনে হয়। কিন্তু মীরার গায়ের শাড়িটা চমৎকার। সস্তার একটা ছাপা শাড়ি বটে; কিন্তু শাড়ির জমির রং-টা হালকা সবুজ, তার উপরে যেন কুচো কুচো জবার কুঁড়ি ছিটানো। আঁচলটাতে শুধু ঘন লালের মোটা মোটা টান আঁকা।

বিমলেন্দু বলে—আপনি বি. এ. পড়ুন। এ বিষয়ে আপনার বাবাকে আমি চিঠি দেব।

উত্তর দেয় না মীরা।

বিমলেন্দু বলে—আমি আবার আসবো।

—কবে? প্রশ্ন করতে গিয়ে মীরা সরকারের এতক্ষণের শান্ত চোখ দুটো ঝিক করে হেসে ওঠে।

বিমলেন্দু—দেখি কবে আসতে পারি। আসবার আগে অবশ্য চিঠি দেব।

চমকে ওঠে মীরা। বিমলেন্দু বলে—হ্যাঁ, কিন্তু এসেই যেন দেখতে পাই…।

মীরা—বলুন।

বিমলেন্দু—যেন দেখতে পাই…।

কি-যেন বলতে চায় বিমলেন্দু। চেষ্টা করে নয়, যেন বুকের ভিতর থেকে একটা আশার উল্লাস আপনি উথলে উঠতে চাইছে। কিন্তু বলতে গিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলছে বিমলেন্দু।

মীরা বলে—তাহলে আমরা এখন যাই।

বিমলেন্দু ট্রেন ছাড়ুক, তারপর…!

মীরা না।

বিমলেন্দু - কেন ?

উত্তর দেয় না মীরা।

বিমলেন্দু দু'পা এগিয়ে গিয়ে নিখিল সরকারের মেয়ের ছায়ার কাছে এসে দাঁড়ায়।—বলতে পারছ না কেন মীরা, কিসের লজ্জা ? ভয়ই বা কিসের ?

মীরার ভয়ের মনটাকে যেন বিস্ময়ে ভরে দিয়েছে বিমলেন্দু। যেন আপনজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে মীরা। মীরা বলে—কাউকে চলে যেতে দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে; সে যেই হোক না কেন ?

বিমলেন্দু হেসে ফেলে—তাই বল। কিন্তু…

বিমলেন্দুর বুকের ভেতর যেন নিশ্চিন্ত হয়ে একটা আকাশ হেসে উঠেছে, সে আকাশে একটা জয়পতাকা উড়ছে। হারাপুরে এসে ভুল করেনি, অপমানিত হয়নি, বিদ্রূপ করেনি কোন অভিশাপ। ভাগ্যের শুধু চোখ দুটো কড়া আলোর দিকে তাকাতে গিয়ে ধাঁধিয়ে গিয়েছিল।

ট্রেন ছাড়তে বোধহয় আর পাঁচ মিনিটও বাকি নেই। ওদিকের উৎসবের নাটকে ড্রপ সীন পড়লো কি ?

চোখ তুলে তাকায় বিমলেন্দু। ওঃ, নাটকের শেষ অঙ্কটা যে এত নিদারুণ হবে, কল্পনাও করতে পারেনি বিমলেন্দু। সেলুনের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন ডি. কে. রায়। ধীরা অতসী আর সুমনা, তিন

জনের তিনটি হাত একসঙ্গে ব্যগ্র হয়ে ফুলের তোড়া তুলে ধরেছে; আশ্বাসলোলুপ তিনটে রঙীন পিপাসা যেন মরিয়া হয়ে ডি. কে. রায়ের করুণার কাছে মাথা খুঁড়তে চাইছে। দেখা যাক্, দুই চোখ অপলক করে তাকিয়ে থাকে বিমলেন্দু, কাকে আশ্বস্ত করে সুখী হবে ডি. কে. রায়ের চোখের হাসি! কার হাত থেকে ফুলের তোড়া তুলে নেবে ডি. কে. রায়? দেখা যাক্, সৌভাগ্যের চাঁদ কার কপালে টিপ পরিয়ে দেয়!

ডি. কে. রায় ডাক দিলেন—চাপরাসী!

চাপরাসী এগিয়ে যায়—হুজুর!

ডি. কে. রায়—এই তিনটে ফুলের তোড়া নিয়ে সেলুনের ভেতরে রেখে দাও।

হাত পাতে চাপরাসী। তিনটে ফুলের তোড়া তিনটি হাতের মুঠো থেকে ঝুপ ঝুপ ক'রে চাপরাসীর হাতের উপর খসে পড়ে।

ধীরা অতসী আর সুমনা, তিনটি রঙীন ফানুসের প্রাণ যেন একটা ঝড়ের হাতের চড় খেয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়েছে। ট্রেনের ঐ প্রান্ত থেকে এই প্রান্তের দিকে তাকিয়েছে তিনটে উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

বিমলেন্দু ব্যস্ত হয়ে ডাকে—কুলি, কুলি!

মীরার দুই চোখ যেন হঠাৎ আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে ঝাপসা হয়ে যায়। বিমলেন্দু বলে—আমি চলে যাচ্ছি না মীরা। আমি নেমে যাচ্ছি। আমি যাব না।

—কেন? আরও আতঙ্কিত একটা বিস্ময়ের আর্তনাদের মত মীরার প্রশ্নটা যেন করুণ হয়ে কেঁপে ওঠে।

ফার্স্ট ক্লাসের কামরার ভিতর থেকে বিমলেন্দুর যত জিনিসপত্র ঝটপট নামিয়ে ফেলেছে কুলিরা।

বিমলেন্দু বলে—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা না করে আমি যাব না মীরা। তাই নেমে পড়লাম।

যেন একটা ক্লান্ত হাসির মিছিল, ধীরা অতসী আর সুমনা, যখন আস্তে আস্তে হেঁটে ট্রেনের এই প্রান্তে এসে বিমলেন্দুর ছায়ার কাছে থমকে দাঁড়ায়, তখন ট্রেনের গার্ড হুইসিল দিয়েছে, ফ্ল্যাগ দুলিয়েছে।

ধীরা চেঁচিয়ে ওঠে—আপনার ট্রেন যে ছেড়ে যাচ্ছে!

বিমলেন্দু—যাক না।

অতসী—আপনার জিনিসপত্র যে এখনও এখানেই পড়ে আছে।

বিমলেন্দু—থাকুক না।

সুমনা—আপনি যাবেন না মনে হচ্ছে!

বিমলেন্দু—তাই তো মনে হচ্ছে।

ধীরা হাসে—ব্যাপারটা কি?

অতসী হাসে—রহস্য বলে মনে হচ্ছে।

সুমনা হাসে—অদ্ভুত রহস্য।

ধীরা অতসী আর সুমনার তিন জোড়া চোখ এইবার তীব্র হয়ে নিখিল সরকারের মেয়ের মুখটাকে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিমলেন্দু—ইনিই হলেন রহস্য। নিখিলবাবুর মেয়ে মীরা।

ধীরা—তার মানে?

বিমলেন্দু—তার মানে, মীরাকে একেবারে সঙ্গে নিয়েই কলকাতায় ফিরবো।

অতসী—কি বললেন?

বিমলেন্দু—বিয়েটা হীরাপুরেই হবে।

সুমনা—তবে তো, বেশ অদ্ভুত কাণ্ডই হবে।

বিমলেন্দু—হ্যাঁ, অন্তত আপনাদের তিনজনকে নিমন্ত্রণ করতেই হবে।

মানবিকা

আর এখানে বেশিক্ষণ নয়। শুধু আর তিনটি ঘণ্টার অপেক্ষা; তার পরেই আবার ট্রেন ধরবে তাপস।

ছুটি পাওয়া যায় নি। তবু রবিবারটাকে কাজে লাগাতে হয়েছে। শনিবার রাত্রিবেলা মঞ্জুলাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে রওনা হয়েছে তাপস। চক্রধরপুরে এসে পৌঁছেছে রবিবার বেলা এগারটারও কিছু পরে। সুতরাং, তিনটের ট্রেনই ধরতে হয়, তা হলে কাল সোমবারে কলকাতায় পৌঁছে ঠিক সময়মত অফিসের কাজে হাজির হতে পারা যাবে।

চক্রধরপুরের এই বাড়ি হলো বিপিন ডাক্তারের বাড়ি; তার মানে মঞ্জুলার বাপের বাড়ি; অর্থাৎ তাপসের শ্বশুরবাড়ি। টাউনের একটু বাইরে, বেশ একটু নিরিবিলি খোলামেলা জায়গাতে এই বাড়িটা। দূরের পাহাড়ের গা জড়িয়ে আর এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে টেবোঘাটের সড়ক; সে সড়কের ছবিটা এ বাড়ির এই বারান্দাতে বসেই দেখা যায়।

বারান্দাতে একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে ঐ পাহাড়ী ঘাটের আর শালবনের দিকে তাকিয়ে সময় পার করে দিচ্ছে তাপস। মঞ্জুলা সেই যে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে, তারপর আর এক মুহূর্তের জন্যও এদিকে আসে নি। এখানে, এই বারান্দার উপর যে তাপস নামে একটা অস্তিত্ব চুপ করে বসে আছে, এই সামান্য সত্যটাও বোধহয় একেবারে ভুলে গিয়েছে মঞ্জুলা।

বেশ আশ্চর্যের ব্যাপার; বেশ একটু অস্বাভাবিক। প্রায় এক বছর পরে মেয়ে আর মেয়ের বর বাড়িতে এসেছে; অথচ বাড়িতে

একটা খুশীর সাড়া জেগে উঠলো না। আরও একটা কথা; মঞ্জুলার বিয়ে হবার পর এই প্রথম বাপের বাড়িতে এসেছে মঞ্জুলা; তাপসও বিয়ের পর এই প্রথম শ্বশুরবাড়িতে এসেছে। অথচ, সারা বাড়িটাই যেন একটা নির্বিকার আর নীরব শান্ত ও উদাস হয়ে ঘটনাটাকে কোনমতে সহ্য করছে। যেন কারও কোন কথা বলবার নেই; হাসবার দরকার নেই; একটু ছুটোছুটি করবারও দরকার নেই।

অথচ, বাড়িতে লোক আছে। বিপিন ডাক্তারও তো এতক্ষণ ছিলেন। তিনি এই কিছুক্ষণ আগে বাগানের ওদিক দিয়ে আর ওপাশের গেট দিয়ে বের হয়ে চলে গেলেন। তাপসের কাছে আসেন নি বিপিনবাবু; তাপসের সঙ্গে একটা কথা বলবার, কিংবা তাপসের রাত-জাগা ক্লিষ্ট মুখটাকে একবার দেখবারও দরকার আছে বলে বোধহয় মনে করেন নি। হ্যাঁ, একটা চাকর অবশ্য এসেছে। তাপসকে চা আর খাবার দিয়ে গিয়েছে। চা আর খাবার খেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরিয়েছে তাপস; আর চুপ করে বসে বসে দূরের শালবনের চেহারা দেখেছে। এখনও দেখছে।

মঞ্জুলার মা অবশ্য নেই। তিনি মেয়ের বিয়ে দেখেন নি। আজকের এই দুঃসহ ঘটনাকে দেখবার দুর্ভাগ্য থেকেও বেঁচে গিয়েছেন। তিনি মারা গিয়েছেন অনেকদিন আগেই; বোধহয় সাত বছরেরও আগে।

কিন্তু বড় বউদি আছেন, মেজ বউদি আছেন। এঁরা তো সম্পর্কে গুরুজন হন। এঁরা তো একবার ঘরের বাইরে এসে তাপসের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারতেন।

তাই বা কেন? বাড়ির জামাই চুপ করে ঘরের বাইরের বারান্দায় বসে থাকবে; তাকে ঘরের ভিতরে এসে বসতে কেউ বলবে না; এর চেয়ে অদ্ভুত ব্যবহার আর কি হতে পারে? আজই দুপুরে এসে, আবার আজই মাত্র আর তিন ঘণ্টা পরে বিকালের ট্রেনে চলে যাবে

তাপস, বাড়ির কোন মানুষ তাকে একটা দিনের জন্যও থেকে যেতে অনুরোধ করবে না, এটাই বা কেমন কথা ?

তাপস জানে না ; কিন্তু এ রকমেরই কথা হয়ে আছে। এই এক বছর ধরে মঞ্জুলার চিঠিতে বড় বউদি আর মেজ বউদি যে সত্য জানতে পেরেছেন, আর, স্বয়ং বিপিনবাবুও যে-সত্য বুঝতে পেরে গিয়েছেন, তাতে আজ তাপসকে সমাদর করবার দরকার আছে বলে কেউ মনে করবে না। মঞ্জুলা তৈরী হয়েই এসেছে ; এ-বাড়ির মনও আগে থেকে তৈরী হয়ে আছে। তাপস না এলেই ভাল হতো। কিন্তু নিতান্তই যখন এসেছে, তখন বসে থাকুক, তারপর চলে যাক্।

তাপস এসেছে, এটা তাপসেরই একটা মূর্খ উৎসাহের দোষ। মঞ্জুলাকে চক্রধরপুরে পৌঁছে দেবার জন্য মঞ্জুলা তাপসকে অনুরোধ করে নি। ন'মামা কলকাতা থেকে টাটানগর যাচ্ছেন ; সুতরাং ন'মামা অনায়াসে একটু ঘুরপথ হয়ে মঞ্জুলাকে চক্রধরপুরে পৌঁছে দিয়ে টাটানগর চলে যাবেন। এই ব্যবস্থাই করে রেখেছিল মঞ্জুলা। কিন্তু তাপস নিজেই হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বললো—আমিই যাব। নাই বা পেলাম ছুটি। শনিবার রওনা হব, রবিবার দুপুরে পৌঁছবো ; আবার রবিবারই বিকেলের ট্রেনে রওনা হয়ে সোমবার সকাল দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাব। বাস্, ঠিক সময়েই অফিস করতে পারা যাবে।

বিপিন ডাক্তার মনে মনে অনেক আক্ষেপ করেছেন ; মাঝে মাঝে মুখ খুলে বলেও ফেলেছেন—না, খুবই ভুল হয়েছে।

অর্থাৎ তাপসের সঙ্গে মঞ্জুলার বিয়ে দেওয়া খুবই ভুল হয়েছে। ভুলটা অনেকটা জেনে-শুনেই করা হয়েছে। বড় বউদি আর মেজ বউদি দু'জনেই জানতেন, বিপিন ডাক্তারও সবই জানতে পেরেছিলেন, সন্দীপের সঙ্গে বিয়ে হলেই সুখী হবে মঞ্জুলা।

সন্দীপ, দেখতে শুনতে খুবই ভাল ছেলে, ভাল কাজ করে, ভাল লেখাপড়া শিখেছে ; আর, একটা বছরেরও বেশিদিন ধরে মঞ্জুলার

সঙ্গে বেশ চেনা-শোনাও হয়েছিল। বড় বউদি আর মেজ বউদির কাছে স্পষ্ট করে বলে দিতেও বাকি রাখেনি মঞ্জুলা; বিয়ে যদি করি তবে সন্দীপকেই বিয়ে করবো।

—তার মানে?

—তার মানে, সন্দীপ যদি বিয়ে করতে রাজি না হয়; তবে আমার বিয়েই হবে না।

—কিন্তু সন্দীপ কি বলে?

—সেটা তোমরা জিজ্ঞাসা করে দেখ।

সন্দীপকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সন্দীপ বলেছিল, আমার একটুও আপত্তি নেই।

বড় বউদি—ওভাবে বলো না; একটু স্পষ্ট করে বল।

সন্দীপ লজ্জিতভাবে হেসেছিল—আমার ইচ্ছেও তাই।

সন্দীপের সঙ্গেই যে মঞ্জুলার বিয়ে হবে, এ বিষয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। সন্দীপ যখন নতুন চাকরি পেয়ে টাটানগর চলে গেল, তখন বড় বউদি কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন—মঞ্জু তবে আর কতদিন অপেক্ষা করবে?

লজ্জিতভাবে হেসেছিল সন্দীপ—যতদিন ইচ্ছে অপেক্ষা করুক। আমাকে অবশ্য যেদিনই চিঠি দেবেন আপনারা...।

নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন বড় বউদি।

টাটানগর থেকে মঞ্জুলাও কয়েকটা চিঠি পেয়েছিল। সে-চিঠি বড় বউদি আর মেজ বউদি দু'জনেই এক ফাঁকে পড়ে ফেলেছিলেন। আর, আরও নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন; ভালবাসা যখন হয়েছে, তখন আরও কিছুদিন দেরি করতে পারা যায়। মঞ্জুলার জন্যে আর কোন পাত্র খোঁজ করবার কোন মানে হয় না। সন্দীপ আরও কিছুদিন দেরি করতে চায়। দেরি করুক। তাতে কিছু আসে যায় না। আর মঞ্জুলাও বিয়ের জন্য এমন কিছু উতলা হয়ে উঠছে না।

কিন্তু ভাগ্যেরই দোষ বলতে হবে। একটু ভাবতে, বুঝতে, সহ্য করতে আর ধৈর্য ধরতে এমন কয়েকটা ভুল হয়ে গেল, যে-জন্যে আজ মঞ্জুলাকে আর এ-বাড়ির সব মানুষকেই অনুতাপের জ্বালা ভুগতে হচ্ছে।

শোনা গেল, সন্দীপের নাকি টাটানগরেরই এক ভদ্রলোকের খুব সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছে। কে যে খবরটাকে প্রথম রটিয়েছিল, কে জানে? কিন্তু খবরটা এই চক্রধরপুরেও পৌঁছে গেল।

সন্দীপকে চিঠি দিয়েছিল মঞ্জুলা, চিঠি দিয়েছিলেন বড় বউদি, শেষে বিপিন ডাক্তারও একটা চিঠি দিয়েছিলেন। সবারই চিঠিতে ঐ একটি উদ্বিগ্ন আর করুণ প্রশ্ন—এ কি খবর শোনা যাচ্ছে? খবরটা নিশ্চয় ভয়ানক একটা মিথ্যে।

সন্দীপের কাছ থেকে কোন উত্তর আসেনি।

খোঁজ নিয়ে জানতে পেলেন বিপিন ডাক্তার, সন্দীপ বোম্বাই চলে গিয়েছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বোঝা গেল না, সন্দীপের বিয়ে হয়ে গিয়েছে কি হয় নি।

বড় বউদি বললেন—বুঝতে আর কি অসুবিধে আছে?

মেজ বউদিও বলেন—যে-ছেলে এতগুলি চিঠির একটারও উত্তর দিলে না, আর বোম্বাইও চলে গেল, সে-ছেলে কি-যে করে বসে আছে সেটাও খুব বুঝতে পারা যাচ্ছে।

বড় বউদি—আমার তো মনে হয়, বিয়ে করেছে সন্দীপ।

মেজ বউদি—নিশ্চয়। তা না হলে আমাদের চিঠির উত্তর দেবে না কেন?

চক্রধরপুরে সন্দীপের বাড়িতে শুধু একটা মালী থাকে; সে মালীও কিছু বলতে পারে না। সে শুধু জানে, বাবু বোম্বাইয়ে আছেন; আর মাঝে মাঝে মালীর মাইনেটা পাঠিয়ে দেন।

মঞ্জুলার প্রাণটাও এই অপমানের জ্বালা সহ্য করতে গিয়ে পুরো তিনটে মাস যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। কারও সঙ্গে একটা কথাও বলে নি মঞ্জুলা। কোন অভিমানের কথা নয়। কোন আক্ষেপের কথা নয়।

একটা বছর পার হবার পর বিপিন ডাক্তার বললেন—মঞ্জুলার তো বিয়ে দেওয়া উচিত।

বড় বউদি- উচিত ঠিকই, কিন্তু মঞ্জুলা কি রাজি হবে?

—রাজি করাও।

বড় বউদি আর মেজ বউদি দিনের পর দিন অনুরোধ করেছেন। কিন্তু মঞ্জুলা যেন অবিচল। বিয়ে করতে রাজি নয় মঞ্জুলা।

মঞ্জুলার ন'মামা কলকাতা থেকে লিখলেন – বেশ ভাল পাত্র আছে, আমারই জানা-শোনা ছেলে তাপস। ভাল চাকরি করে। বেশ শিক্ষিত ছেলে। মঞ্জুলা যদি রাজি হয় তবে অবিলম্বে জানাবেন। আমি বললে তাপসও রাজি হয়ে যাবে।

বিপিন ডাক্তার দুই পুত্রবধূর সঙ্গে পরামর্শ করেন। —ছেলেকে তো ভাল বলেই মনে হচ্ছে।

বড় বউদি—মঞ্জু যদি ভাল মনে করে, তবেই…।

বিপিন ডাক্তার—কথাটা হলো, আজ হয়তো তাপসকে ভাল বলে মনে করছে না; কিন্তু…তার মানে, বিয়েটা যদি হয়ে যায়, তবে… কালক্রমে ভাল সম্পর্ক হয়েই যাবে। সেটাই স্বাভাবিক।

বড় বউদি—আমারও তো তাই মনে হয়। চেনা শোনা হবার পর আপনা থেকেই…।

বিপিন ডাক্তার—তাহলে তোমরা ওকে একটু বুঝিয়ে বল।

মঞ্জুলাকে খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন মেজ বউদি—আপত্তি করবার কোন মানে হয় না মঞ্জু। বিয়ের পরেও ভালবাসা হয়, আর সেটাই হলো আসল ভালবাসা।

মঞ্জুলা রাগ করে চেঁচিয়ে উঠেছিল—ভালবাসা চাই না। তবে বিয়ে হোক্। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।

মঞ্জুলার এই সম্মতি যে দুরন্ত এক অনিচ্ছার সম্মতি, এটা সেদিন বুঝতে পেরেও সাবধান হন নি বিপিন ডাক্তার। মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর তাপসের সঙ্গে যেদিন কলকাতা রওনা হলো মঞ্জুলা, সেদিন বাড়ির আর সবারই চোখ জলে ভরে গিয়ে ছলছল করেছিল ; কিন্তু মঞ্জুলার চোখ শান্ত, শুকনো খটখটে। বিপিন ডাক্তারকে আর দুই বউদিকে শান্তভাবে প্রণাম করে নিয়ে গাড়িতে উঠেছিল মঞ্জুলা ; ঘটনাটা যেন কোন ঘটনাই নয়, মঞ্জুলার জীবনটাকে এই বিয়ের উৎসবের কোন ফুলের আর গন্ধধূপের সৌরভ যেন স্পর্শও করতে পারে নি। যেন এপাড়া থেকে ওপাড়াতে বেড়াতে যাচ্ছে মঞ্জুলা।

দুই

কলকাতার জীবন। কে জানে, সেদিন মনটা কেন যেন বেশ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, কলকাতার এই বাড়িটাকে যদি সত্যিই ভাল লাগতো, তবে ভালই হতো। আড়াল থেকে তাপসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে যদি ভাল লাগতো, তবে ভালই হতো। তাপস যখন অফিস থেকে ফিরে এসে ঐ ঘরে চুপ করে আর একলা হয়ে বসে থাকে, তখন ঐ ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতে যদি ইচ্ছে হতো, তবে ভালই হতো। এই ভদ্রলোক তো কোন অপরাধ করে নি।

কিন্তু মাত্র ঐ একদিন ; সেদিনের মনের ভাবনাটা যেন বৈশাখের আকাশের এক টুকরো হঠাৎ-মেঘের মত দেখা দিয়েছিল। তারপর

আর নয়। এই এক বছরের মধ্যেও নয়। তাপসকে সহ্য করবার কথা মনে উঠলেই মনটা যেন বিষিয়ে যায়।

কি করে সম্ভব? তাপস দেখতে কুৎসিত নয় ঠিকই; কিন্তু কেমন-যেন একেবারে সাদা-সিধে একটা চেহারা। মুখের কথাগুলি যেন প্রাণহীন কতগুলি ভাষার শব্দ। শুধু চাকরি আর বাড়ি, এ-ছাড়া ভদ্রলোকের জীবনে যেন আর কোন সত্য নেই। ভদ্রলোক কোনদিন বাগানে দাঁড়িয়ে রাত্রির আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়েছে কিনা সন্দেহ। অন্তত মঞ্জুলার তো চোখে পড়ে নি।

মঞ্জুলাকে এ বাড়িতে আনবার কি দরকারই বা ছিল এই ভদ্রলোকের? কোনদিন তো কোন কাজের জন্য মঞ্জুলাকে ডাকবার দরকার বোধ করেন না ভদ্রলোক। চাকর আছে, রান্নার লোক আছে। যা দরকার তা সবই পেয়ে যান ভদ্রলোক। স্নান করেন, খাবার খান, অফিস চলে যান। মাঝে মাঝে, ঘরে বসেই একগাদা কাগজ-পত্র নিয়ে অফিসেরই কাজের লেখা লেখেন। এ রকমের একটা রিক্ত মনের মানুষ বিয়ে করলোই বা কেন? এর জীবনে কোন স্ত্রীর দরকার হয় না। এই মানুষ কারও স্বামী হবার যোগ্যও নয়।

তাপসের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। পৃথিবীটা বলবে, এই তাপসই হলো মঞ্জুলার স্বামী। কিন্তু মঞ্জুলার মন জানে, ওটা একটা অসার ছায়া মাত্র। একটা দুর্ভাগ্যের অংক থেকে আর-একটা দুর্ভাগ্যের অংকে এসে পৌঁছেছে মঞ্জুলার অদৃষ্টের নাটকটা। যাকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারা যাবে না, তারই বাড়িতে একটি ঘরে বসে রঙীন শাড়ি পরে একটা মিথ্যে ঘরণীর রূপ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে।

একদিন সত্যিই, জোর করে মনটাকে যেন ভেঙ্গে-চুরে একটা কাণ্ড করতে চেয়েছিল মঞ্জুলা। অফিস থেকে ফিরে এসে যখন বাইরের ঘরে একা বসেছিল তাপস, তখন এগিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজার

কাছে দাঁড়িয়েছিল মঞ্জুলা। তাপস হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে মঞ্জুলার দিকে তাকিয়েছিল আর হেসেছিল।

ছিঃ, যেন এক গাদা শুকনো ধুলোর হাসি। চমকে উঠে আর চোখ বন্ধ করে, তখনই চলে এসেছিল মঞ্জুলা। দেখতে একটুও ভাল লাগে নি।

দেখতে ভয় করে। আর, খুবই বুঝতে পারে মঞ্জুলা, দেখতে কেমন-যেন ঘেন্নাও করে। তাপসের জীবনের কোন কাজ, কোন কথা, কোন হাসির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া অসম্ভব। জোর করে একটা দুঃস্বপ্নের সঙ্গে ঘর করা যায় না। এখানে মরতে পারা যায়; কিন্তু বাঁচতে পারা যায় না।

হঠাৎ একদিন চক্রধরপুরের একটা চিঠি এসে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের বার্তাকে যেন গুঞ্জন করে মঞ্জুলার কানের কাছে শোনাতে থাকে। বড় বউদি লিখেছেন, সন্দীপ এসেছে। সে-খবরটা নিতান্ত মিথ্যে একটা খবর, সন্দীপ বিয়ে করে নি। যাই হোক্, আশা করি তুমি আর তাপস ভালই আছ।

বড় বউদিকে সেদিনই চিঠির উত্তর দিয়েছিল মঞ্জুলা তাপস নামে একটি শাস্তির সঙ্গে আমি বেশ সুখেই আছি। তোমাদের দুশ্চিন্তা করবার দরকার নেই। আর ঐ নতুন খবরটা আজ আমাকে জানাবার কোন দরকার ছিল না।

এই চিঠির পর আরও কয়েকটা চিঠি লিখে বড় বউদিকে সত্যিই একেবারে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে মঞ্জুলা। জেনেছেন বড় বউদি, না, তাঁদের সব কল্পনা মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। এই একবছরের মধ্যেও তাপসকে মেনে নিতে পারে নি মঞ্জুলা। তাপসকে সহ্য করবার আর সামর্থ্যও নেই বোধহয়; তা না হলে এত স্পষ্ট করে এসব কথা লিখবে কেন মঞ্জুলা? —আমি এখানে থাকবো না। আমি এই ঘেন্না থেকে সরে যেতে চাই। তাপসের সঙ্গে তোমরা যদি কোন সম্পর্ক রাখতে

চাও, রেখো ; কিন্তু আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। আমি ন'মামার সঙ্গে শিগগির চক্রধরপুর যাচ্ছি।

বড় বউদি আর মেজ বউদি আগেই আলোচনা করে রেখেছেন, দেখা যাক্ কি হয়? যদি সত্যিই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তবে…।

বড় বউদি বলেন—তবে মনে হয়…সন্দীপকেই বিয়ে করতে রাজি হবে মঞ্জু।

মেজ বউদি—কিন্তু সন্দীপ?

বড় বউদি এখন তো সন্দীপের কথা থেকেও বোঝা যায়, সন্দীপ মনে মনে খুব একটা আঘাতও পেয়েছে।

—কেন?

—মঞ্জুর বিয়ে হয়ে গিয়েছে দেখতে পেয়ে।

—কিন্তু এটাও তো একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, তুমি ভাল ছেলেটি এতদিনে তবে চুপ করে বসেছিলে কেন? একটা চিঠিও দাও নি কেন?

—সন্দীপ বলছে, চিঠি দিয়েছিল।

—কে জানে? চিঠি দিলে চিঠি না পাওয়ার তো কোন কারণ নেই।

—যাই হোক্। এখন তো সন্দীপ কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হলো তাপস। তাপসকে যখন সহ্যই করতে পারবে না মঞ্জু, তখন……।

—তখন ওর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

বড় বউদি আর মেজ বউদির পক্ষে আজ আর কিছু বলবার নেই। কারণ মঞ্জুলা এসেই গিয়েছে। মঞ্জুলার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, যেন ওর প্রাণটা এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে একটা স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে মঞ্জুলা—আমার যা বলবার তা তো আগেই বলে দিয়েছি। আমাকে আর একটি কথাও জিজ্ঞাসা করো না।

বড় বউদি—তাপস কি তবে……।

মঞ্জুলা—এখনই চলে যাবে।

বড় বউদি—তুমি কি তবে……।

—না। ওর কাছেও আমার আর কিছু বলবার নেই।

তাপসকে এ-বাড়ির কোন মানুষ কোন কথা বলবে না। তাপসকে এই বাড়িটাও যেন কোনমতে শুধু তিনটে ঘণ্টার অস্বস্তির মত সহ্য করছে।

তিন

ঘরের ভিতরে টেবিলের কাছে একটি চেয়ারে বসে বই পড়ছিল মঞ্জুলা। এই বইটা এখানে এক বছর ধরে পড়ে আছে, তবু হারিয়ে যায় নি। এই বইয়ের ভিতরে একটি পাতায় যার নাম লেখা আছে, সে মানুষটাও হারিয়ে যায় নি। আবার ফিরে এসেছে। এখানেই আছে। কে জানে, এখন বোধহয় বাড়ির মালীর সঙ্গে বাগানে ঘুরে ফিরে গন্ধরাজের গোড়ায় সার-মাটি ছড়াচ্ছে। ফুল ফলানো সন্দীপের জীবনেরই একটা শখ ছিল। সে শখ এখনো আছে বোধহয়। আর-একটা শখ ছিল, বিকেল হবার পরেই এই বাড়িতে একবার বেড়াতে আসবার। খবর পায়নি কি সন্দীপ, মঞ্জুলা যে এসেছে? খবর পেয়েছে বোধহয়; তবু এখনই নিশ্চয় আসবে না। এখনও তো বিকেল হয় নি; আর……বারান্দার উপরে বসে আছে যে, মঞ্জুলার জীবনের একটা অকাম্য আর্বিভাব, সে এখনও আছে। ভালই হয়, তাপস চলে যাবার পরেই যেন সন্দীপ আসে। তাপসকে চোখে দেখলে সন্দীপও হয়তো মঞ্জুলার শাস্তির রকমটা দেখে হেসে ফেলবে।

এই বইটা হাতে তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরেই পড়ছে মঞ্জুলা। কিন্তু একটা পাতাও পড়তে পেরেছে কিনা সন্দেহ। বইটাই বার বার তিনবার আনমনা মঞ্জুলার হাত ফস্‌কে পড়ে গিয়েছে। এই বইটারও গায়ে

যেন একটা বিশ্রী রকমের ধুলো লেগে আছে। মনটা জোর করে ধরতে চায়, কিন্তু হাতটা যেন ময়লা হয়ে যাবার ভয়ে শিথিল হয়ে যায়। ধপ্ করে পড়ে যায় বইটা। সন্দীপ ফিরে এসেছে, সন্দীপ এখানে আছে, সন্দীপ আর-একটু পরেই আসবে ; মনে হয় চমৎকার একটি ঠাট্টার কথা ভাবছে মঞ্জুলার মনটা। এক বছরের মধ্যেও একটা চিঠির উত্তর দেয় নি যে, সে-মানুষের মনের বাগানে গন্ধরাজ ফোটে কিনা সন্দেহ।

বইটাকে টেবিলের উপর ফেলে রেখে দেয় মঞ্জুলা।

বড় বউদি বলেন—বড় বিশ্রী ব্যাপার হলো।

—কি ?

—তাপস চলে যাচ্ছে।

—যাবেই তো।

—হ্যাঁ, যাবে ঠিকই। কিন্তু যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছে।

—না।

মঞ্জুলার নিশ্চিন্ত মনটা আবার অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। আবার নির্বোধের মত এমন আহ্বান করে কেন ভদ্রলোক ? কিছুই তো জানিয়ে দিতে বাকি রাখেনি মঞ্জুলা। কলকাতাতেই একদিন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল, আমার এখানে থাকতে একটুও ইচ্ছে নেই।

আসবার সময় ট্রেনেও একবার আরও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল —আমি আর কলকাতায় ফিরে যাব না।

আর, এই তিন ঘণ্টা ধরে বাইরের বারান্দায় বসে সারা বাড়ির অশ্রদ্ধা আর তুচ্ছতা পেল যে লোকটা, সে কি এতই নির্বোধ যে, এখনও কিছু বুঝতে পারছে না ? মঞ্জুলার সঙ্গে যে এ-জীবনে কোন সম্পর্ক থাকবে না, এই সত্যটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু দেখতে পায় নি কি ? তবে কোন্ লজ্জায় আর কোন্ সাহসে যাবার আগে মঞ্জুলার সঙ্গে কথা বলতে চায় ?

অস্বীকার করে না মঞ্জুলা ; কল্পনা করে বেশ বুঝতে পারে, মঞ্জুলার মনের এইসব কথা যদি কেউ শুনতে পায়, সে মঞ্জুলাকে একটা হিংস্রতার প্রাণী বলে মনে করবে। বিয়ে হয়েছে যার সঙ্গে, লোকে যাকে মঞ্জুলার স্বামী বলে জানে, তাকে এইভাবে একটা জঞ্জালের মত সরিয়ে দেওয়া! শুনতে পেলে যে-কোন মানুষ বিপিন ডাক্তারের মেয়েকে একটা নির্মমতার দানবী বলে মনে করবে। কিন্তু দোষ কার? তাপস যদি না আসতো, তবে তো এই বাড়িটাকে আর মঞ্জুলাকে এমন সাংঘাতিক অভদ্রতার কাণ্ড করতে হতো না। একটু দুঃখ হয় বইকি। এত নির্বোধ হলো কেন মানুষটা?

বড় বউদি বলেন—যাও একবার ; একটা কথার কথা বলে দিয়ে চলে এস।

মেজ বউদি—সবই তো বুঝতে পেরেছেন তাপসবাবু, তবে আবার মিছিমিছি কথা বলতে চান কেন?

বড় বউদি—আমারও একটা সন্দেহ হয় ; বোধহয় একটা বাজে কথা অপমানের কথা-টথা বলে যেতে যায় তাপস।

মেজ বউদি—হতে পারে ; আশ্চর্য নয়।

মঞ্জুলা বলে—অপমানের কথা-টথা বললেও বুঝতাম, লোকটা নির্বোধ নয়।

বড় বউদি—তবে আর কি? একবার গিয়ে কথাটা শুনে নিয়েই চলে এস। আর এ সব সহ্য করতে পারছি না।

বড় বউদির মুখটা যেন একটা যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে যায়।

কি-যেন ভাবে মঞ্জুলা। তারপর, যেন একটা শান্ত আক্রোশের মত শক্ত একটা মূর্তি ধরে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।—তিনটের ট্রেন ধরতে হবে যখন, তখন আর দেরি করছো কেন?

তাপস—তাই তো, আর দেরি করবার মানে হয় না।

মঞ্জুলা—তবে যাও।

আবার ঘরের ভিতরেই চলে আসছিল মঞ্জুলা। কিন্তু তাপস ডাকে—একটা কথা ছিল?

মঞ্জুলা—কি?

তাপস—তুমি তো তাহলে এখন এখানেই থাকবে।

—সেকথা তো আগেই বলেছি।

—না, সেজন্যে বলছি না। বলছি, বর্ষার এই মাস দুটো এখানকার স্বাস্থ্য খুব সুবিধের নয়। শুনেছি এই দু'মাস এখানে নানারকম অসুখ-বিসুখ…।

মঞ্জুলার চোখে দুঃসহ অস্বস্তির ভ্রূকুটিটা আরও শক্ত হয়ে ওঠে। এই প্রলাপ শোনাও যে একটা বিশ্রী শাস্তি।

তাপস হাসে—একটু সাবধানে থেকো। আর কলকাতায় পৌঁছেই আমি দু'শিশি কড লিভার অয়েল পাঠিয়ে দেব।

—কেন? কার জন্যে?

—তোমার জন্যে তোমার তো একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে দেখেছি।

—ভাল কথা। কিন্তু পাঠাবার দরকার নেই। দরকার হলে ও-জিনিস এখানেই পাওয়া যাবে।

—আচ্ছা চলি। তাপস নামে সেই অবাঞ্ছিত অস্তিত্বের মুখ জুড়ে অদ্ভুত এক নির্বোধের হাসি জ্বলজ্বল করতে থাকে।

মঞ্জুলাব চোখ দুটো যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। এ কী রকমের সাংঘাতিক হাসি! লোকটা যেন নিজের বুকের রক্তের দিকে তাকিয়ে হাসছে। মঞ্জুলা বলে—তুমি সবই বুঝতে পেরেছো তো?

তাপস—বুঝেছি।

—কি বুঝেছো?

—তুমি আর কলকাতায় যাবে না।

—কেন যাব না, সেটাও নিশ্চয় বুঝেছো।

—বুঝেছি বই কি। আমার কাছে থাকতে তোমার ভাল লাগে না।

—কেন ভাল লাগে না ?

—সেটা তুমি জান।

—তুমি জান না ?

—আমি তো শুধু জানি, তুমি নিতান্ত অনিচ্ছায় আমাকে বিয়ে করেছো। কাজেই, তোমাকে খুব ভুগতে হলো।

—তোমাকে তো কিছুই ভুগতে হয় নি, হবেও না।

—হবে বইকি।

—কেন ? তোমার কিসের অসুবিধে ?

—আমার বেশ খারাপ লাগবে।

—কেন ?

—সোজা কথা। তুমি আমাকে পছন্দ কর নি; কিন্তু আমি তো তোমাকে খুবই পছন্দ করেছি।

—পছন্দ করে তোমার লাভটা কি ? আমি তো তোমাকে···।

—কি ?

—কোনদিন তোমাকে একটা কথাও বলে···।

—তবু···।

—তার মানে ?

—তবু ঘরে তো ছিলে। এখন অফিস থেকে ফিরে এসে ঘরটাকে ফাঁকা মনে হবে। এই যা।

চুপ করে কি-যেন ভাবতে থাকে তাপস। তারপরেই মঞ্জুলার মুখের দিকে তাকায়।

থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে মঞ্জুলার চোখ। তাপসের চোখে এ কী ভয়ানক দৃষ্টি ! নির্বোধ হাসির মুখটা কী-ভয়ানক চতুর আর কত হিংস্র। তাপস নামে সেই মানুষটার যে এরকম একটা মুখ আর ও-রকম দুটো চোখ থাকতে পারে, কোনদিন যে কল্পনাও করতে পারে নি মঞ্জুলা।

তাপস বলে—চলি।

মঞ্জুলা—শোন।

তাপস—কি ?

মঞ্জুলা—তুমি কি ক্ষমা করে যেতে পারবে না ?

—ক্ষমা ? তোমার দোষ কোথায় যে ক্ষমা করবো ?

—দোষ আছে বইকি।

—কোন দোষ নেই।

—কিন্তু তুমি যে বলছো…।

—কি বলছি ?

—আমি না থাকলে ঘর ফাঁকা লাগবে।

—লাগবে।

ফুঁপিয়ে উঠে দু'হাত তুলে চোখ ঢাকে মঞ্জুলা—তবে আমাকে নিয়ে চল।

বড় বউদি আর মেজ বউদি দু'জনেই সামনে এসে দাঁড়ান।—চুপ কর মঞ্জু।

মঞ্জু বলে —না বউদি, এই ট্রেনেই চলে যাই।

মৃগনয়না

শরতের এই নীল আকাশ ; যে-আকাশের দিকে তাকালে সকলেরই চোখ মুগ্ধ হয়ে যাবে, সে-আকাশের দিকে তাকালে হিরণের চোখ দুটো মুগ্ধ হয় না কেন ?

মুগ্ধ হয় কি না হয়, সেটা অবশ্য হিরণই বলতে পারে। কিন্তু বলে না। কেউ কখনও শোনেনি যে, পৃথিবীর কোন সুন্দরতার দিকে তাকিয়ে কোনদিন বলেছে হিরণ--কী চমৎকার !

কোনদিন কোন ফুলবাগানের দিকে তাকিয়েও কি বলতে পেরেছে হিরণ, কী চমৎকার ! কোনদিনও না।

পরেশবাবুর বাগানটার দিকে তাকালে সবারই চোখ জুড়িয়ে যায়। যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনই রঙীন। বাগানের সবুজ ঘাস সমান করে ছাঁটা। কাঁটা গাছের বেড়াও যেন একটা পরিপাটি সরলতা। ফুলের চারদিকে যে-সব ফড়িং প্রজাপতি আর ভোমরা উড়ে বেড়ায়, তারাও যেন একটা ছন্দ মেনে চলে। এলোমেলো ভাবে উড়ে বেড়ায় না। এখানে টকটকে লাল ফুল, ওখানে সাদা, পিছনে হলদে করবী আর নীল অপরাজিতা। বাগানটা সত্যিই যেন ফুটন্ত বৈচিত্র্যের একটা বিস্ময়।

এই সেদিনও হিরণ এসেছিল। পরেশবাবুর বাগানটার কাছে দাঁড়িয়েছিল। বাগানটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো। তারপরেই বলে উঠলো—মাধবীলতাটা শুকনো।

সারা বাগানটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলে, অনেক চেষ্টা করে আর অনেক সময় নিয়ে আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে সত্যিই দেখা যায় ; পাঁচিলটার ঐদিকে এক কোণে একটা মাধবীলতা শুকিয়ে রয়েছে।

বেশ তো; কোন সন্দেহ নেই, পরেশবাবুর এত বড় বাগানটার এক কোণে সত্যিই একটা বিশ্রী শুষ্কতা লুকিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু এই বাগানের এই যে শত শত সুশ্রী ফুল পাতা আর লতা বাতাসে দুলছে; যা দেখে ফড়িং আর প্রজাপতির চোখও মুগ্ধ হয়েছে, সেটা কি হিরণের চোখে পড়েনি?

সত্যিই পড়েনি। তা না হলে, অন্তত এত বড়-বড় বসরাই গোলাপগুলির সম্পর্কে একটা খুশির মন্তব্য করতো হিরণ।

কিন্তু চোখে না পড়বার তো কথা নেই। বসরাই গোলাপের একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখেছে হিরণ। তবু মুখ থেকে একটা সামান্য খুশির উচ্ছ্বাসও শব্দ করে বেজে ওঠেনি। মনে হয়, পৃথিবীর কোন ভাল জিনিসকে ভাল বলতে গেলে হিরণের বুকটাই ফেটে যাবে। বোধহয় ওর নিঃশ্বাসেই একটা নিদারুণ সতর্কতা আছে; যেন ভুলেও ভালকে ভাল বলে না ফেলতে হয়।

এবিষয়ে হিরণের জীবনটা যেন সংযমের একটা প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠেছে। কখনও, ভুলেও, মুখের কথার ফাঁকে কোন প্রশংসার, প্রশস্তির, অভ্যর্থনার বা কৃতার্থতার ভাষা যেন বেজে না ওঠে। বন্ধুরা ইচ্ছে করেই পরেশবাবুর বাগানের শোভা সম্পর্কে কতবার আলোচনা করেছে। পরীক্ষা করে বুঝতে চেষ্টা করেছে, হিরণের প্রাণটা খুশি হয়ে সেই চমৎকার বাগানের একটা ফুলেরও একটু সামান্য প্রশংসা করে কিনা। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। এবিষয়ে হিরণের মুখ যেন প্রতিজ্ঞা করে বন্ধ করা একটা মুখ। কোন মন্তব্য করে না হিরণ। যদি নেহাৎই করে তবে সেটা হলো একটা খুঁত আবিষ্কারের কথা। অর্থাৎ; সেই শুকনো মাধবীলতাটা।—বড় বিশ্রী দেখতে ঐ মাধবীলতাটা, মন্তব্য করে হিরণ।

চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে পাড়ার প্রায় সবারই নেমন্তন্ন হয়েছিল। খুব ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন চৌধুরী সাহেব। নেমন্তন্নের

আসরের জন্য ফোর্ট থেকে ভাড়া করে প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা আনিয়েছেন। ফোর্টের ব্যাণ্ড পার্টিও এসেছে। আর, ভোজের যে আয়োজন করেছেন, সে আয়োজন যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনই সুন্দর আর তেমনই বিপুল। তিন রকমের পোলাও আর চার রকমের মাংস রান্না করা হয়েছে। রান্না করেছে নবাববাড়ির খানসামার দল।

অতিথিরা খুশী; অতিথিরা পরিতৃপ্ত, অতিথিরা মুগ্ধ। চৌধুরী সাহেবের হাসিমুখের অভ্যর্থনায় সকলে আরও খুশি। সত্যিই, চৌধুরী সাহেবের ভদ্রতার তুলনা হয় না।

হিরণ বলে—মিষ্টি পোলাওটার বাদামগুলো কেমন যেন কচ্‌কচ্‌ করলো। চৌধুরী সাহেবের একটা চোখ কেমন যেন কুঁচকে রয়েছে দেখা গেল। সামিয়ানাটার এক-জায়গায় একটা তালি আছে। ব্যাণ্ড মাস্টারের মুখে বসন্তের দাগ।

সমীর বলে—ঠিকই বলেছো হিরণ; কিন্তু আর কি দেখলে বল?

নৃপেন বলে—মাংসের কালিয়াটা কেমন লাগলো?

হরিপদ বলে—ভোজের জায়গাটা কেমন সাজানো হয়েছিল, বল?

সমর বলে—ব্যাগপাইটার টিউন কেমন লাগলো?

একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেয় না হিরণ। বোধহয় হিরণের অন্তরাত্মাই উত্তর দিতে পারে না। কে জানে কি-রকমের নিদারুণ একটা বাধা যেন হিরণের মুখ বন্ধ করে রেখেছে। কিছুতেই বলতে পারলো না হিরণ, চৌধুরী সাহেবের বাড়ির এই চমৎকার ভোজ-সভায় এসে চমৎকার কিছু দেখলো কিনা, চোখে পড়লো কিনা, কিংবা অনুভব করলো কিনা হিরণ।

কিন্তু সেজন্যে এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, হিরণ কখনও হেসে ওঠে না, ওর চোখে কিংবা মুখের ভাষায় কখনো কোন উল্লাস জেগে ওঠে না। সুকুমারবাবুর মেয়ের বিয়ের সময়; যখন একদিকে নিমন্ত্রিতেরা ভিড় করে খেতে বসেছে আর ওদিকে বিয়ের মন্ত্রপাঠ

শুরু হয়েছে, ঠিক সেই সময় বিদ্যুতের তারে কি একটা গোলমাল হয়ে সব আলো একসঙ্গে হঠাৎ নিভে গেল। সুকুমারবাবু যেন আতঙ্কিতের মত একটা আর্তনাদ করে ওঠেন। সমর হরিপদ আর সমীরও আক্ষেপ করে ওঠে—আঃ, ভদ্রলোক সত্যিই বিপদে পড়লেন।

কিন্তু চেঁচিয়ে হেসে ওঠে হিরণ—বাঃ, বেড়ে অন্ধকার। নেমন্তন্ন খাও এবার! বিয়ের মন্তর এবার ঘ্যানর ঘ্যানর করুক।

নরেশবাবু একবার কলেজে গিয়েছিলেন, ছেলের পরীক্ষার ফী জমা দিতে। লোকের কাছ থেকে ধার করে আর নিজেরই একটা আংটি বেচে দিয়ে টাকা যোগাড় করেছিলেন নরেশবাবু। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, কলেজে উপস্থিত হয়েই দেখলেন, পকেটে টাকা নেই। ট্রামে কিংবা বাসে কোন চোর নিশ্চয়ই পকেট থেকে টাকা তুলে নিয়েছে।

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন নরেশবাবু। পথে দেখা হতে হিরণকেও এই দুর্ভাগ্যের খবরটা বলেছিলেন নরেশবাবু। কিন্তু শোনামাত্র হিরণের চোখ দুটো যেন ছটফট করে হেসে উঠলো; চেঁচিয়ে উঠলো হিরণ—বাঃ, চোর ব্যাটার তো বেড়ে হাতসাফাই। একটুও টের পাননি বোধহয়।

নরেশবাবু বলেন—একটুও না।

হিরণ বলে—কি করে যে এমন অদ্ভুত হাতসাফাই হয়; আশ্চর্য!

হিরণের মুখের সেই ছটফটে ভাষার উল্লাসটা যেন জোরে হাতসাফাই-এর উদ্দেশে একটা বিস্ময়ের ঘোষণা।

এইভাবেই চলছে হিরণের জীবনটা। কেউ কোন নতুন বাড়ি তুলেছে, দেখতে গিয়ে বাড়িটার একটা খুঁতই শুধু চোখে পড়ে হিরণের। সিঁড়ির সিমেন্টের এক জায়গায় একটা ফাটল দেখা দিয়েছে। আর একটা জানালার কাঠ চিড় খেয়ে এক জায়গায় ফেটে গিয়েছে।

কিন্তু আর কি কিছু নেই, যেটা দেখতে ভাল; খুবই শোভন আর সুন্দর?

না; হিরণ বলতে পারে না, বলেও না যে, বাড়িটার মোজেয়িক বড় চমৎকার, ঘরগুলি বেশ বড়-বড়, আর খুব আলো-হাওয়া আছে।

বাড়ির মালিক যদুবাবু বলেন—সিমেণ্টে বড় ঠকে গেছি হে। প্রায় দশটন সিমেণ্টে ভেজাল ছিল। অর্ধেকই মাটি।

এইবার হেসে ওঠে হিরণের মুখটা—বাঃ, সিমেণ্টওয়ালা দেখছি খুব ওস্তাদ!

এটাও হিরণের চরিত্রের একটা অদ্ভুত আগ্রহ। কারও দুর্ভাগ্যেও একটা সহানুভূতির কথা বলতে যেন হিরণের বিবেকেই বাধা আছে, মানা আছে। আজ পর্যন্ত কেউ কখনও হিরণকে এমন কথা বলতে শোনে নি যে, আহা, অমুক বেচারা খুবই অসুবিধেয় পড়েছে। নিখিলের বড় ক্ষতি হয়ে গেল। চারুবাবুর উপর এটা বড় অন্যায় করা হচ্ছে।

চোখের উপরেই তো দেখা যায়, পাড়ার কত নিরীহ মানুষ বিপদে পড়েছে, কষ্ট পেয়েছে, সমস্যায় পড়েছে, দুশ্চিন্তা করছে। হিরণও দেখতে পায় বইকি। বন্ধুরা যখন আলোচনা করে, তখন সবই মন দিয়ে শোনেও হিরণ। কিন্তু, একটা আক্ষেপ? না, কখনও না। একটা সহানুভূতির কথা? না, কখনও না। বলতেই পারে না হিরণ।

দুই

মনে হচ্ছে, বেশ একটা অসুবিধেয় পড়েছে হিরণ। সমর বলে—ঠিক বুঝতে পারছি না, কিসের অসুবিধে?

সমীর বলে—এটা একটু আশ্চর্যের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে; ঠিক বিয়ের পরেই হিরণ যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

হরিপদ বলে—অথচ, বিয়ের পর দু'-তিনটে মাস তো খুব বেশিরকম খোশমেজাজে ছিল হিরণ।

—তা ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, মেজাজে যেন ছিটে-ফোঁটা ফুর্তিও নেই।

সমর—সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, মনোজের সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছে হিরণ।

চমকে ওঠে সমীর—তাই নাকি ?

সমর—হ্যাঁ, অথচ মনোজ হলো ওরই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

হরিপদ—কবে থেকে এ ব্যাপার চলছে ?

সমর—তা জানি না।

হরিপদ—আমি কিন্তু একটা আন্দাজ করতে পারছি।

সমীর—কি ?

হরিপদ—আমার মনে হয়, সেই যে, সেই প্রথম দিনেই যে কাণ্ডটা হলো, তারপর থেকে……।

সমীর—প্রথম দিন মানে ?

হরিপদ—সেই যে, বউভাতের দিন, যেদিন আমরা সবাই হিরণের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করলাম।

সমর—তা তো মনে পড়েছে; কিন্তু তার মধ্যে কোন কাণ্ড হতে তো দেখিনি।

হরিপদ—আমি দেখেছিলাম।

সমীর—কি ?

হরিপদ—ঐ যে মনোজ একটা কথা বললো, তারপর হিরণের স্ত্রী মনোজের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো।

হ্যাঁ, এইবার সবারই মনে পড়ে। হিরণের কথায় সুমিতা যেন চমকে উঠেছিল; আর মনোজের মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল; সুমিতার প্রাণটা যেন হঠাৎ একটা শ্রদ্ধার গুঞ্জন শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছিল আর সারা মুখ সুস্মিত হয়ে উঠেছিল।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়; সামান্য একটা প্রশংসার ব্যাপার।

সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় একটা কথা হরিপদর কানের কাছে বলে ফেলেছিল মনোজ—সত্যিই চমৎকার দুটো চোখ, একেই বলে মৃগনয়না।

সমীর, হরিপদ আর সমর আর কিছু জানে না এবং তার আগে যে ব্যাপারটা হয়ে গিয়েছিল, তার কিছু খবর রাখে না। তাই ওদের পক্ষে ঘটনাটাকে একটা দুর্বোধ্য বিস্ময় বলে মনে হবে, এটা স্বাভাবিক।

সুমিতার মুখের দিকে তাকালে সবারই চোখে যে সত্য সবার আগে দেখা দেবে, সেটা হলো সুমিতার ঐ চোখ দুটো! একেবারে নিখুঁত দুটি সুন্দর চোখ। সুমিতাও জানে, তার রূপের ভুল আর যা-কিছু কিংবা যত-কিছুই থাকুক না কেন, অন্তত চোখ দুটোকে কেউ নিন্দে করবে না। যার চোখ আছে, সে সবার আগেই সুমিতার ঐ টানা-টানা কালো চোখ দুটোকেই দেখবে আর খুশি হবে।

কিন্তু শুনে চমকে উঠেছিল সুমিতা। জীবনে যার কাছ থেকে সবচেয়ে খুশির স্বরে কথাটা শুনতে পাবে বলে আশা করেছিল সুমিতার মন, তারই কাছ থেকে একটা অদ্ভুত কথা শুনতে পেল সুমিতা। বাসর ঘরে, সেই প্রথম আলাপের প্রথম ক্ষণে, যখন সুমিতার সেই টানা-টানা কালো চোখ দুটো হেসে-হেসে আরও নিবিড় আর লাজুক হয়ে হিরণের মুখের দিকে তাকায়, তখন হঠাৎ বলে ওঠে হিরণ, তোমার ঘাড়ের ওপর ওটা কি? আঁচিল? না, জরুল?

সুমিতার চোখের হাসি স্তব্ধ হয়ে যায়। মনের আশাটা যেন হঠাৎ একটা আঘাত পেয়ে মুষড়ে পড়ে।

হিরণ হাসে—তোমার বাঁ কানের কাছে ওটা কিসের দাগ? মনে হচ্ছে, একটা ফোড়া হয়েছিল?

সুমিতা মাথা হেঁট করে—হ্যাঁ।

বিয়েতে দানসামগ্রী যা পেয়েছে হিরণ, সেটা মতি মাসিমার মত

রাগী আর খুঁতখুঁতে মানুষের কাছেও প্রশংসা পেয়েছে।—না, বেয়াই কিপটেমি করেনি; বেশ ভাল জিনিসই দিয়েছে।

কিন্তু সুমিতা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়। হিরণ বলে—মিররে কেমন যেন তিনটে স্ক্র্যাচ আছে; আর ফুলদানিটার পালিশ একটু ম্যাটমেটে।

কিন্তু মেহগনির অমন চমৎকার পালংকটা? তার মধ্যে তো খুঁত নেই। সেটা যে একটা চমৎকার জিনিস, এ কথাটা একটু খুশি হয়ে বলতে পারে না কেন হিরণ? একবার জিজ্ঞেসও করেছিল সুমিতা—পালংকটা বাবা নিজে পছন্দ করে কিনেছেন।

কিন্তু সুমিতার মুখের এই খুশির কথাটা শুনেও, আর চোখের জিজ্ঞাসাটাকে দেখেও উত্তর দিতে পারে নি হিরণ।

সরবত তৈরী করতে সুমিতার দক্ষতার কথা কে না জানে? শ্বশুর বাড়িতেও সুমিতার সরবতের স্বাদুতা সকলের প্রশংসা পেয়েছে। সরবত খেয়ে একটাও প্রশংসার কথা শুধু একজন বলতে পারে নি, সে হলো হিরণ। তবে একটা কথা বলেছে হিরণ।—তোমার চা কিন্তু সুবিধের নয় সুমিতা।

—কেন? কি হলো?

—কখনো দেখছি খুব মিষ্টি, কখনো আবার একেবারেই মিষ্টি নয়।

মনোজ আসে মাঝে মাঝে। সুমিতা নিজেই চা তৈরী করে। সে চা খেয়ে মনোজ কোন প্রশংসা করে না, নিন্দেও করে না। কিন্তু একটি কথা বলে—আপনার হাতের সরবত কিন্তু অতুলনীয়। আমি জীবনে কখনও এত ভাল সরবত খাইনি।

সুমিতা হাসে—একটা মাসের মধ্যে সরবত খাওয়ার লোভেও তো একদিন এলেন না।

মনোজ হাসে—বেশ তো, বলেন তো রোজই আসবো। দেখি কত সরবত খাওয়াতে পারেন।

সুমিতা —আসুন। একটুও ভয় পাই না।

অবশ্য রোজই আসে না মনোজ। কিন্তু, মনে হয়, সুমিতা যেন রোজই একটা আশা নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকে। হিরণকেই তাগিদ দিয়ে কথা বলে—কই, তোমার বন্ধু যে আজও এলেন না।

হিরণ গম্ভীর হয়ে বলে —তা আমি কি করে বলবো?

হিরণ গান গাইতে পারে ভাল। মাঝে মাঝে নিজেই যেন একটা আশার উৎসাহে এসরাজ বাজায় আর গান গায়। সুমিতা কাছেই বসে গান শোনে। গান শেষ হবার পর হিরণের চোখ দুটো যেন উৎসুক হয়ে সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বোধহয় হিরণের মনে একটা প্রশ্ন তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে; জানতে চায় হিরণ, গান শুনে কত খুশি হলো সুমিতা।

সুমিতা ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়—গান গাইবার সময় তোমার মাথাটা এত দোলে কেন?

চমকে ওঠে হিরণ. চোখের দৃষ্টিটা যেন তিক্ত হয়ে যায়। আর কিছুই দেখলো না, বুঝলো না সুমিতা; শুধু হিরণের মাথা দোলানো অভ্যাসটাই সুমিতার চোখে পড়লো!

কিন্তু মনোজের গলার স্বর যে এত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, গান গাইবার সময় মনোজের গলা যে তিন পর্দাতেও চড়তে পারে না, সেটা তো কোন দিন বুঝলো না সুমিতা? কোন দিনও তো এমন কথা বলল না যে, মনোজের গলার স্বর সুবিধে নয়।

ফটো তুলিয়েছে হিরণ। শহরের সবচেয়ে ভাল ষ্টুডিওর হাতের কাজ। ফটোতে কোন খুঁত আছে বলে মনে হয় না। খুঁত থাকলেও চোখে পড়বে না। কিন্তু ফটো দেখা মাত্র হেসে ফেলে সুমিতা।

হিরণ বলে—হাসলে কেন?

সুমিতা বলে—কানটা আবছা হয়ে গিয়েছে।

ঠিকই, দেখতে পায় হিরণ, ফটোর চেহারাটাতে একটা কান সামান্য

একটু আব্‌ছা হয়ে গিয়েছে ঠিকই; কিন্তু ফটোর নাক মুখচোখ যে হেসে-হেসে জীবন্ত মূর্তির নাক মুখ আর চোখের মত ঝক্‌ঝক্‌ করছে; এটা কি চোখে দেখতে পেল না সুমিতা? অদ্ভুত!

কিন্তু একদিনও তো একথাটা বললো না সুমিতা, মনোজ একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। চোখে না দেখবার তো কথা নয়। মনোজ যখন গল্প করে আর চা খেয়ে চলে যায়, তখন সুমিতা হিরণেরই কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে।—মনোজবাবুর রুচি কিন্তু বেশ ভাল।

—কেন?

—দেখছো না, কী চমৎকার সিল্কের একটা কামিজ পরেছেন।

সুমিতার মুখের দিকে যেন একটা রুক্ষ রিক্ত আর অসহায় দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে হিরণ। সে দৃষ্টিতে যেন দুঃসহ একটা জ্বালাও লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁপতে থাকে।

তিন

শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছে হিরণ। আজ মনোজের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবে সুমিতা। টিকিট কেনা হয়েই গিয়েছে।

হিরণের চোখের তারা দুটো যেন ক্ষমাহীন একটা আক্রোশে চাপতে গিয়ে কাঁপতে থাকে। -এসব আবার কি আরম্ভ করলে?

সুমিতা—কি বললে?

হিরণ—তোমার যে চক্ষুলজ্জা বলেও কোন পদার্থ নেই।

সুমিতা হেসে ফেলে—আমার চোখই নেই; চক্ষুলজ্জা থাকবে কেমন করে?

হিরণ—তুমি সত্যিই তাহ'লে সিনেমা দেখতে যাবে?

সুমিতা—কি আশ্চর্য, তুমি এত রাগ করে কথা বলছো কেন?

হিরণ—রাগ করে নয়; আশ্চর্য হয়ে কথা বলছি।

—কিসের আশ্চর্য ?

—শত হোক্, স্বামীর বন্ধু যতই বন্ধু মানুষ হোক ; তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া কোন স্ত্রীর পক্ষে…বেশ একটু বাড়াবাড়ির ব্যাপার হয়ে যায় সুমিতা। তুমি যেও না।

সুমিতাও গম্ভীর হয়—আমি যাব।

হিরণ—না, যেও না।

সুমিতা—কেন ?

হিরণ—ভাল দেখায় না।

সুমিতা—কেন ভাল দেখায় না ?

হিরণ—একবার বলেছি। না শুনে থাকলে আর শুনতে চেয়ো না।

সুমিতা—শুনেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি।

হিরণ—বুঝতে পারবেও না কোন দিন।

সুমিতা—তুমি বুঝিয়ে দিতে পারবে না।

হিরণ—ইচ্ছে করলেই পারি।

সুমিতা—তোমার ইচ্ছেই হবে না।

চুপ করে সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হিরণ। সুমিতার কথাগুলি যেন একরোখা কতগুলি অর্থহীন প্রতিবাদ। আবার হেঁয়ালির মতও মনে হয়। কি যেন বলতে চাইছে সুমিতা, কিন্তু বলতে পারছে না বলেই এলোমেলো করে অন্য কথা বলছে।

কিন্তু সুমিতা বোধহয় বুঝতে পারছে না, এই এলোমেলো প্রতিবাদ আর তর্কের ভাষা কী সাংঘাতিক বিষের জ্বালা ছড়িয়ে হিরণের মনটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। স্বামীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এ কী দুঃসাহসের কথা অক্লেশে বলে দিতে পারছে সুমিতা !

না বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। যে নারীর চোখে এত ভুল, সে

নারীর মনেও ভুল দেখা দিতে কতক্ষণ? ভুল এরই মধ্যে দেখা দিয়ে ফেলেছে কিনা কে জানে?

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে অন্য ঘরের দিকে চলে যেতে গিয়েই থম্‌কে দাঁড়ায় সুমিতা। সুমিতা যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে আনমনার মত দরজার বাইরের গাছপালাগুলির দিকে তাকিয়ে আছে। কে জানে কি দেখছে সুমিতা? কিন্তু সুমিতার টানা-টানা কালো চোখ দুটো ছলছল করছে। কী অদ্ভুত এই চোখ! জলে ভরে গিয়ে সে চোখের সুন্দরতা যেন আরও গভীর হয়ে টলমল করছে।

কিন্তু আজ সুমিতার এই সুন্দর চোখ দুটো বোধহয় হিরণের জন্য কোন আশা নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারবে না। সুমিতার চোখ যেন অন্য কারও জন্যে কাঁদছে।

—ছিঃ! হিরণের গলার স্বর যেন একটা যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে ধিক্কার দিয়ে ওঠে।

সুমিতা কোন উত্তর না দিয়ে তেমনই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। যেন প্রাণপণে মনের ভিতরে একটা বিদ্রোহের সঙ্গে বোঝাপাড়া করছে সুমিতা। তাই কোন কথা বলতে পারছে না।

হিরণ বলে—এমন সুন্দর চোখেও এমন ভুল হয়?

চমকে ওঠে সুমিতা—কি বললে? কার চোখ?

—তোমার চোখ।

—কি করেছে আমার চোখ?

—তোমার চোখ দুটো শুধু দেখতেই চমৎকার, কিন্তু···।

ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় সুমিতা। তারপর হিরণের কাছে এসে আর হিরণের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলে। আর সঙ্গে সঙ্গে হেসেও ফেলে—কবে দেখলে, আমার চোখ দেখতে চমৎকার?

—রোজই দেখছি।

—কোনদিন তো বলনি।

—সেটাই বোধহয় ভুল হয়েছে।

—কিন্তু···।

—কি ?

—তোমার চোখ যে আর-একটা ভুল করেছে !

—কি ?

—এতক্ষণ ধরে দেখেও বুঝতে পারনি, সুমিতা কার জন্যে আর কেন কাঁদছে।

হিরণ—কার জন্যে ?

সুমিতা—তাহলে এখনও বুঝতে পারনি দেখছি।

হিরণ—তার মানে ?

সুমিতা—তার মানে, মনোজের সঙ্গে আমার সিনেমা দেখতে যাবার কোন কথাই হয়নি।

চমকে ওঠে হিরণ—কে বললে ? দুটো টিকিট যে দেখলাম।

সুমিতা—হ্যাঁ। আমার আর তোমার টিকিট।

অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে থাকে হিরণ—তবে ?

সুমিতা—তবে এক কাপ চা নিয়ে আসি। তারপর রওনা হব।

হিরণ—বেশ।

চা নিয়ে আসে সুমিতা। আর, চা খেয়ে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে হিরণ—চল, আর দেরি করে লাভ নেই। আজকের চা-টা কিন্তু চমৎকার হয়েছে।

বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই মাথার কাপড় টানে সুমিতা—সমরবাবু আসছেন।

হিরণ বলে—সমরের মুখের হাসিটা দেখছো, সত্যিই দেখতে চমৎকার। নয় কি ?

সুমিতা হেসে ফেলে—হ্যাঁ।

হিরণ বলে—বাঃ!

সুমিতা—কি হলো?

হিরণ—পরেশবাবুর বাগান থেকে হাস্নুহানার গন্ধ ভেসে আসছে।

সুমিতা—হ্যাঁ।

হিরণ—ভারী সুন্দর; চমৎকার মিষ্টি গন্ধ।

দ্বিরাগমন

পরেশ রায় কেমন ছেলে ?

প্রশ্নটা এ-শহরের যাকেই জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন, প্রত্যেকেই বলবে, ঐ একরকমের ছেলে ; ভাল নয় মন্দও নয় ; সামান্য সাধারণ রকমের ছেলে।

কিন্তু পরেশের সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাস্করকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, তবে বেশ অপ্রসন্নভাবে আর বেশ রুক্ষ স্বরেই বলে দেবে ভাস্কর —নিতান্ত বাজে স্বভাবের ছেলে।

—কেন ?

—ট্রেচারাস বলে পরেশের একটা সুনাম অবশ্য আছে ; কিন্তু এক ফোঁটা সৎসাহস নেই। বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ববোধ নেই।

ভাস্করের মন্তব্যটা ভাষার হেঁয়ালির মত মনে হবে। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, ভাস্কর তার ধারণার কথাটাই অকপটভাবে ব্যক্ত করেছে। ভাস্করের বোধহয় নিজেরই ধারণার সত্য-মিথ্যা দিয়ে তৈরী একটা জগৎ আছে। সে জগতে পরেশ সত্যিই ট্রেচারাস ; পরেশের কোন সৎসাহস নেই। পরেশের মনুষ্যত্ববোধ বলতেও কিছু নেই।

পরেশ একবার ভাস্করের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কোনদিন সনাতনবাবুকে আর কোনরকমের সাহায্য করবে না। যদি চার আনা পয়সাও ধার চান সনাতনবাবু, তবু পরেশ সোজা বলে দেবে, না, হবে না।

সনাতনবাবুকে সাহায্য করা মানে, সনাতনবাবুর সেই বিশ্রী স্বভাবের মেয়েটাকে সাহায্য করা। কারণ, সনাতনবাবু লোকটা মানুষের কাছে হাত পেতে পেতে দু'চার টাকা যা রোজগার করে,

সেটা সনাতনবাবুর মেয়েরই যত শখের দরকারে খরচ হয়ে যায়। ভাল শাড়ি ; ভাল পাউডার আর সেণ্ট ; আর ভাল সুর্মা। মেয়েটা কেন যে এত সাজে, সেটা আর সন্দেহ করে বুঝতে হয় না ; বোঝাই যায়। ত্রিশ টাকার কেরানীগিরি করে যে-সনাতনবাবুর দু'বেলার পুরো ভাতও হয় না, সে সনাতনবাবুর মেয়ের এধরনের রূপসী সাজবার শখ যে একটা বাজে স্বভাবের শখ, সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধে নেই। প্রমাণ আরও আছে। শুধু ভাস্কর নয়, পরেশ নিজেও কতবার দেখেছে, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের একটা ছেলের সঙ্গে, তার মানে নীহারের সঙ্গে, কথা বলছে সনাতনবাবুর মেয়ে বসুধা। নীহার বয়সে অবিশ্যি নিতান্ত ছেলেটা নয় ; পরেশ আর ভাস্করেরই সমান। পার্থক্য শুধু এই যে, নীহার বেশ স্টাইল করে সাজে ; মুখে স্নো মাখে, আর বেশ চমৎকার গান গায়। আর পরেশ যদিও স্নো মাখে না, কিন্তু তবু নীহারের চেয়ে দেখতে অনেক ভাল। নীহার অবশ্য বড়লোকের ছেলে ; আর পরেশ নিতান্ত কেরানী, মাইনে পঞ্চাশ টাকা।

সনাতনবাবুর যেদিন জলবসন্ত হয়েছে বলে খবর পেল পরেশ, সেদিন পরেশ সত্যিই যেন আনমনার মত সনাতনবাবুর বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আর কি ? ভাস্করের কাছে বলা প্রতিশ্রুতির কথাটা বোধহয় একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। সনাতনবাবু যা যা বললেন, সবই কিনে এনে দিল পরেশ। দশ সের চাল, দু'সের ডাল, এক সের সরষের তেল। কিছু মিছরি, দুটো কাপড়-কাচা সাবান···আর, হ্যাঁ, বসুধার জন্য একটা সুগন্ধ মাথার তেল আর একটা গায়ে-মাখা সাবান। সবসুদ্ধ প্রায় এগার টাকার জিনিস কিনে আর সনাতনবাবুর ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে এসেছিল পরেশ।

ভাস্কর বলছিল—তুমি আমার সঙ্গে এরকম ট্রেচারি করলে কেন ?

পরেশ হাসে—যখন করেই ফেলেছি, তখন আর মিছিমিছি কেন রাগারাগি করছো? যেতে দাও ওসব কথা।

ভাস্কর—কত টাকা চুলোয় গেল?

পরেশ—এগার টাকা।

ভাস্কর—ছি, ছি।

এটাই হলো সেই ঘটনা, যে ঘটনার জন্য পরেশের সম্পর্কে ভাস্করের মনে একটা ধারণা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, পরেশ সত্যিই একটু ট্রেচারাস।

ঠিক কথা; এধরনের আরও কয়েকটা ঘটনা হয়েছে, যাতে দেখা গেছে যে, ভাস্করের কাছে মুখে এক কথা বলে কাজের বেলায় ঠিক উল্টোটি করে বসে আছে পরেশ। দেখে আশ্চর্য হয়েছে ভাস্কর: পরেশের হাসিমুখের প্রতিশ্রুতির ভাষা যেন একটা কপটতার কৌতুক; ওর ইচ্ছার আসল ভাষাটা যেন একেবারে বুকের ভিতরে লুকানো একটা সাংঘাতিক চালাক আর ভয়ানক নীরব একটা প্রতিজ্ঞা।

ভাস্করকে কথা দিয়েছিল পরেশ, সেই মামলাটাতে সাক্ষী হয়ে দুটো কথা একটু ইয়ে করে অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু মিথ্যের মত করে হাকিমের সামনে বলে দিতে পারবে। তা হলে ভাস্করের মক্কেলের একটু সুবিধে হয়। ভাস্করের মক্কেল সেজন্য পরেশের হাতে দুটো দশ টাকার নোট গুঁজে দিতেও রাজি ছিল। পরেশ বলেছিল, না না, একটা সামান্য কাজের জন্যে বেচারা কেন মিছিমিছি এতগুলো টাকা খরচ করবে? আমি এমনিতেই···।

কিন্তু সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে-কথা বলেছিল পরেশ, সে কথার একমাত্র এই মানেই হয় যে, একটা মিথ্যে কথা বলতে চেষ্টা করেও বলতে পারবে না, বলতে চাইছেও না পরেশ। হাকিম হেসে ফেলেছিলেন। ভাস্কর বলেছিল—ছিঃ, তোমার এই সামান্য মর‍্যাল কারেজ, সামান্য সৎসাহসটুকুও হলো না পরেশ?

কিন্তু ভাস্করের মক্কেলের বিপক্ষ পার্টি খুব খুশি হয়ে পরেশের সুনাম গেয়ে বেড়িয়েছিল। সেই ব্যাপার দেখেই আশ্চর্য হয়েছিল ভাস্কর।—বাঃ, তোমার ট্রেচারির তো বেশ একটা সুনাম হয়েছে দেখছি।

এ শহরে ইন্দুবাবুর চেয়ে বেশি সম্মানের মানুষ আর কেউ নেই। যেমন ঐশ্বর্য আছে, তেমনই চালচলনের আভিজাত্যও আছে। খুব শৌখীন বড়লোকও বোধহয় চারবেলায় চারবার সাজ বদলায় না। কিন্তু ইন্দুবাবু সারাদিনের চার বেলায় চারবার গাড়ি বদলান। এহেন ইন্দুবাবুর ছেলের বউভাতে শহরের সব বাঙালীর আর প্রায় সব বড়লোক অবাঙালীর নেমন্তন্ন হয়েছিল। বাদ পড়েছিল শুধু একজন বাঙালী, ঐ সনাতনবাবু। কেমন করে এমন একটা বাদ সম্ভব হলো, সেটা অনেক ভেবেও বুঝতে পারেনি পরেশ। ভাস্কর বলেছিল, খুব ভালো হলো ; এরকমের হওয়াই উচিত।

কিন্তু ইন্দুবাবুর ছেলের বউভাতে নেমন্তন্ন খেতে যায়নি পরেশ। আশ্চর্য হয় ভাস্কর তুমি ইন্দুবাবুর বাড়ির নেমন্তন্নে গেলে না কেন হে পরেশ ?

—ইচ্ছে হলো না।

—কেন ?

—শুনলাম, ইন্দুবাবু কোন কোন ভদ্রলোকেব বাড়িতে নিজে গিয়ে নিজের মুখে নেমন্তন্ন করেছেন।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমার বাড়িতে যান নি।

—নেমন্তন্ন করেন নি ?

- করেছেন ; ইন্দুবাবুর চাকর এসে নেমন্তন্নের একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছিল।

—এই জন্যে তুমি নেমন্তন্নে গেলে না ?

—হ্যাঁ।

—ছিঃ, তোমার একটু মনুষ্যত্ববোধ থাকলে একথা বলতে না, একাজ করতেও না। আমাকেও তো ইন্দুবাবু নিজে নেমন্তন্ন করতে আসেননি, চাকর এসে নেমন্তন্নের চিঠি দিয়ে গিয়েছে। তাতে হয়েছে কি ?

ভাস্করের বক্তব্য শুনে নিয়ে আর কোন কথা না বলেই চলে যেতে থাকে পরেশ। কিন্তু ভাস্কর হঠাৎ কিসের যেন একটা সন্দেহে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—আমার কি মনে হচ্ছে জান ?

—কি ?

—তুমি বোধহয় সনাতনবাবুর সঙ্গে একটা সিমপ্যাথির হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক করে···।

হেসে ফেলে পরেশ—হতে পারে।

চেঁচিয়ে ওঠে ভাস্কর—হতে পারে ?

—হ্যাঁ।

ভাস্কর—ছি ছি, সনাতনবাবুর মত একটা বাজে লোককে ঘেন্না করতে পারলে না, তোমার একটা সামান্য মানসিক উদারতাও নেই দেখছি।

পরেশ কোন কথা না বলেই আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায়।

দুই

সনাতনবাবু বলেন—তুমি কেন ইন্দুবাবুর বাড়ির নেমন্তন্নে গেলে না পরেশ ? তোমার তো নেমন্তন্ন হয়েছিল।

ঘরের খোলা দরজাটার পাশে কে যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নটার উত্তর শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। তারই শাড়ির আঁচলটা মাঝে মাঝে ফুরফুর করে উড়ে ধরা পড়িয়ে দিচ্ছে যে, একজন এখানে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরেশ বলে—আপনাদের নেমন্তন্ন হয়নি বলে আমার ভাল লাগলো না।

সনাতনবাবু অনেক কথা বলবার পর শেষে একটি কথা বললেন—কি যে দোষ করলাম আর কোথায় যে কি ভুল হলো, কিছুই বুঝতে পারছি না পরেশ।

পরেশের গম্ভীর চোখ দুটোও যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বোধ হয় বলতে চায় পরেশ—দোষ হলো, ঐ একমাত্র দোষ, ত্রিশ টাকা মাইনের কেরানী হওয়া। আর ভুল হলো, ঐ একমাত্র ভুল, আপনার মেয়েটার মুখটা এত সুন্দর হওয়া।

কিন্তু বলতে ইচ্ছে করলেও কথাটা যেন গলার কাছে আটকে থাকে। বলে আর লাভ কি? ভাগ্য যাকে এত ধিক্কার দিয়েছে আর দিয়েই চলেছে, তাকে নতুন একটা ধিক্কার না দিলেও চলবে।

সনাতনবাবু বলতে বলতে শেষে হেসেই ফেল্লেন—ইন্দুবাবুর মত রাজা মানুষও আমার মত একটা ভিখিরী মানুষের উপর রাগ করতে পারে, আমি এতটা অবিশ্যি ভাবতে পারিনি পরেশ।

—কেন রাগ করেছেন ইন্দুবাবু?

—কেন করেছেন, সেটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু দেখতেই তো পেলে, সারা শহরের মধ্যে একমাত্র আমাকেই নেমন্তন্ন করতে বাদ দিলেন।

—হ্যাঁ, আমিও সে-কথাই ভাবছিলাম। কেন? এরকমের ব্যাপার কেন হলো?

—ইন্দুবাবু অবিশ্যি আমার একটা উপকার করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমি…।

—উপকার?

—হ্যাঁ। আমার বসুধা তো লেখাপড়া জানে না। অথচ কাজ করতে চায়। তাই ইন্দুবাবুর পুত্রবধূর কাছে গিয়ে একটা কাজ চেয়েছিল। ইন্দুবাবুর বাচ্ছা নাতিটার নার্স হয়ে কাজ করতে চেয়েছিল বসুধা, যদি অন্তত কুড়িটা টাকা মাইনে দেয়।

—তারপর কি হলো ?

—ইন্দুবাবুও বসুধাকে ডেকে আর খুব মায়া করে বললেন, কাজ-টাজ করতে হবে না ; তুমি মাঝে-মাঝে একটু চুপি চুপি এসে টাকা নিয়ে যেও।

—চুপি চুপি কেন ?

—ইন্দুবাবু বলেছেন, তিনি মানুষের উপকার একটু চুপি-চুপি করতেই ভালবাসেন।

—আপনি রাজি না হয়ে ভালই করেছেন।

—আমি রাজি হয়েছিলাম পরেশ ; কিন্তু মেয়েটাই রাজি হলো না।

—ভালই হলো।

—কি করে যে ভাল হলো, তাও যে বুঝতে পারছি না।

—কেন ?

—ওর গতি কি হবে ?

—কার ?

—আমার বসুধার।

—কি হয়েছে বসুধার ?

—বেশ অপমান হয়েছে।

—তার মানে ?

—নীহার ওকে বিয়ে করবে না।

—নীহার কি বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল ?

—তা জানি না। কিন্তু বসুধার বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে, নীহার ওকে বিয়ে করবে।

—কেন এমন বিশ্বাস হলো ?

—বসুধাই জানে। আজ বলছে, নীহারের ভয়ে ওর ঘুমই হচ্ছে না। বলছে, আমাকে এখনি কোথাও পাঠিয়ে দাও।

—নীহার এদিকে আসে ?

—আজকাল আর আসে না।

—ওকে ভয় কিসের ?

—কে জানে ; কিসের ভয় ?

—আপনি তো নীহারকে একবার জিজ্ঞেস করলে পারেন।

—জিজ্ঞেস করেছিলাম।

—কি বলে নীহার ?

—নীহার তো মুখে ভাল কথাই বললে।

—কি ?

—নীহার বললে, আমি তো কোনদিন আপনার মেয়েকে ওসব কোন কথা বলিনি। তবে...হাঁ...বসুধা যদি চায় তবে আমি ভেবে দেখতে পারি।

তাহলে তো বসুধাবই ভুল হয়েছে।

—আমারও তাই মনে হয়। নীহারের মত ভাল ছেলে যে কোন রকমের ইচ্ছে নিয়ে বসুর সঙ্গে গল্প করেছে, সেটা আমারও মনে হয় না।

—তবে কেন গল্প করতে আসতো নীহার ?

সত্যি কথা হলো, নীহার আসতো না। বসু নিজেই ওকে ডাকতো, তাই আসতো।

—কেন ডাকতো ?

—নীহারের বোন মালতীর সঙ্গে বসুর একটু ভাব-সাব ছিল মালতীর অবশ্য বিয়ে হয়ে গেছে, শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে।

—কি বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

—মালতীর খবর-টবর জানবার জন্যেই নীহারকে ডেকে কথা বলেছে বসু, আমার তো এই মনে হয়!

কিন্তু আমার তা মনে হয় না।

যে ঘরে বসে সনাতনবাবুর সঙ্গে কথা বলছে পরেশ, হঠাৎ সে-

ঘরের শান্ত বাতাস যেন চমকে ওঠে। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বসুধা।

সোজা পরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে, আর চোখের দৃষ্টিটাকে যেন রুষ্ট আগুনের শিখার মত জ্বালিয়ে দিয়ে কথা বলে বসুধা—আপনার কি মনে হয়?

চমকে ওঠে পরেশ। সনাতনবাবু আতঙ্কের মত চেঁচিয়ে ওঠেন—ছি ছি, এখানে এসে তুই এ কি-রকম অভদ্রভাবে কথা বলছিস? ভেতরে যা; যা যা যা!

বসুধা বলে—ভাল ছেলে নীহার। চমৎকার ছেলে। খুব দয়ালু ছেলে। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সনাতনবাবুর মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে তার খুবই লজ্জা হয়। সে চায় ঘরের ভিতরে এসে চুপি চুপি গল্প করে···

সনাতনবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—যা যা যা!

চলে যায় বসুধা। আর একেবারে গম্ভীর হয়ে পরেশও যেন একটা বিস্ময়ের জ্বালা চুপ করে সহ্য করতে চেষ্টা করে।

সনাতনবাবু বলেন—তুমি কিছু মনে করো না পরেশ। ছি ছি, আমিও ভাবতে পারিনি যে, তোমাকে এভাবে ধমক দিয়ে অভদ্রভাবে কথা বলতে পারে বসুধা। লেখা-পড়া শেখেনি; মায়ের স্নেহ পায়নি; মা মরেছে সেই কবে, ওর বয়স যখন তিন বছর, আর, বাপ তো দু'বেলা পেট-ভরে ভাত খাওয়াতে পারে না; এমন মেয়ের স্বভাব যে একটা রাগী সাপের স্বভাবের মত হয়ে যাবে, এটা স্বাভাবিক।

পরেশ বলে—না, আমি কিছু মনে করিনি।

সনাতনবাবু—মেয়েটাকে লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে একটা চেষ্টাও করেছিলাম। তোমারই বন্ধু ভাস্করের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম।

—ভাস্কর সাহায্য দিল না?

—দিতে চেয়েছিল। কিন্তু…।

—কি ?

—বসুধা বেঁকে বসলো।

—কেন ?

—সেটা তো আমি ঠিক বলতে পারছি না। কে জানে কি ভেবে…।

আবার ঘরের দরজার কাছে একটা ক্ষুব্ধ বিরক্ত আর রুক্ষ, অথচ বেশ সুন্দর করে সাজানো একটা রূপের মূর্তি যেন একটা হঠাৎ আক্রোশের মত ছুটে এসে ছটফটিয়ে ওঠে—আমি বলতে পারি। আপনার বন্ধু ভাস্কর আমাকে বলেছিলেন, তাঁর সাহায্যের কথা যেন আমি কাউকে না বলি। উনি চুপি-চুপি এসে আমাকে টাকা দিয়ে যাবেন, আর আমি চুপি চুপি টাকা নেব।

—যা যা যা, ভেতরে যা। চেঁচিয়ে ওঠেন সনাতনবাবু।

আবার চলে যায় বসুধা।

পরেশ বলে—আপনার মেয়েকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিন।

সনাতনবাবু—আমিও তাই ভাবছি। একটা জায়গা অবিশ্যি আছে।

পরেশ—কোথায় ?

সনাতনবাবু—কলকাতাতে। সুলতার কাছে।

—সুলতা কে ?

—বসুরই এক মাসতুতো দিদি। সুলতাকে লিখেছিলাম। সুলতা খুব খুশি হয়ে লিখেছে, শিগগির পাঠিয়ে দিন ; এখানে সুখেই থাকবে বসু, ওর সব ভার আমিই নিলাম।

—তবে আর দেরি করছেন কেন ? পাঠিয়ে দিন।

—কিন্তু পাঠাই কি করে ? কিছু টাকা না হলে যে…

—কত টাকা দরকার ?

—অন্তত কুড়ি টাকা।

—নিন। আমি দিচ্ছি

দরজার কাছে আবার সেই মূর্তি, যার নাম বসুধা। সনাতনবাবুর মেয়ে, দু'বেলা পেট ভরে ভাত খায় না, অথচ সুন্দর হয়ে সাজে। বেশ বয়সও হয়েছে। পঁচিশের কম তো নয়। গলায় একটা দার্জিলিং পাথরের মালা দুলছে, ছোট ছোট বরফকুচির মত নকল পাথরের টুকরো দিয়ে গাঁথা ঝকঝকে একটা মালা।

দেখে মনে হয়, যেন একগাছা হীরের কুচি বুকের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে বসুধা। মুখেও লালচে একটা ক্রীম মেখেছে। তা না হলে ভোরের আকাশের রক্তরাগের মত এরকম একটা লালচে আভা এই মেয়ের সারা মুখে ফুটে উঠবে কেন?

চোখে আর সেই কটমটে জ্বালা নেই। যে-ঠোঁটে শক্ত করে দাঁত চেপে ধরেছিল, সে-ঠোঁট কত নরম হয়ে গিয়েছে, চমৎকার স্নিগ্ধ একটা হাসিও যেন ঝরে পড়তে চাইছে।

পরেশেরই মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে বসুধা—ধন্যবাদ, খুব উপকার করলেন। আপনিও চুপি চুপি উপকার করতে পারেন!

তার পরেই যেন একটা ছটফটে উল্লাসের মত ঘরের ভিতরে চলে যায় বসুধা।

সনাতনবাবু বলেন—তুমি বসুধার কথা কানে নিও না পরেশ! ও মেয়ে যেমন অভদ্র, তেমনই মুখরা; তেমনই···।

তিন

এ শহরের প্রায় সকলেই, অন্তত সব বাঙালীই জানে, আজ তিন বছর হলো কোথায় চলে গিয়েছেন সনাতনবাবু, সেই ভয়ানক বিষণ্ণ আর রোগা চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোক, যিনি এক-এক সময় যার তার কাছে সাহায্যের জন্য হাত পেতে ফেলতেন, আর ত্রিশ টাকা মাইনের একটা কেরানীগিরি করতেন।

ভবপারে চলে গিয়েছেন; তিনবছর হলো মারা গিয়েছেন সনাতনবাবু। কিন্তু কেউ জানে না, কেউ বলতেও পারবে না, মারা যাবার দুটো মাস আগে মেয়েটাকে কোথায় পার করে দিয়ে এলেন সনাতনবাবু। ভাস্কর, লোকের হাঁড়ির খবর রাখা যার অভ্যাস, সেও জানে না। আর, সবচেয়ে আশ্চর্য, সনাতনবাবুর বাড়িতে প্রায়ই যেত যে ছোকরা, সেই পরেশও যে-টুকু জানে, সেটা না জানারই মতো; অনেক দূর-সম্পর্কের এক দিদি হয়, তারই কাছে কলকাতাতে চলে গিয়েছে সনাতনবাবুর মেয়ে, পরেশের কাছ থেকে একথা শুনতে পেয়ে ভাস্করই চোখ পাকিয়ে বলে ফেলেছিল- তার মানে বেরিয়ে গেছে।

বোধ হয় দেখতে পায়নি ভাস্কর, অমন নিরীহ ও শান্ত পরেশের চোখ দুটো কী-ভয়ানক দপ্ করে জ্বলে উঠলো। পরেশ বলে— তুমি খুবই ভুল সন্দেহ করে ভয়ানক বাজে কথা বলছো ভাস্কর।

ভাস্করও আশ্চর্য হয়, এরকম উত্তপ্ত স্বরে কোনদিন কথা বলেনি পরেশ। জোর করে কোন কথা বলা যে পরেশের অভ্যাসই নয়। শুধু ওর কথাগুলি কেন, ওর প্রাণটাও যে জোর করতে পারে না। পাশ কাটিয়ে সরে পড়াই ওর ভাগ্যটার নিয়ম।

ভাস্কর বলে—আমি জোর করেই বলছি, সনাতনবাবুর মেয়েটা

বেরিয়ে গেছে। বাপটা বাধ্য হয়ে শুধু পৌঁছে দিয়ে এসেছে সামান্য বুদ্ধি থাকলে তুমিও এটুকু বুঝতে পারতে।

পরেশের দপ্ করে জ্বলে ওঠা চোখ যেন হঠাৎ নিভু-নিভু হয়ে যায়। যেন দুঃসহ একটা যন্ত্রণা এসে চোখ দুটোকে কুঁচকে দিয়েছে।

—যাই হোক্…। কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে ভাস্কর। তারপর অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে।—তুমি তো এবার একটা বিয়ে করলে পার পরেশ।

পরেশ—কেন?

ভাস্কর—মাইনে তো বেড়েছে।

—তা কিছু বেড়েছে ঠিকই।

—কত?

—দশ টাকা।

—মাত্র?

—আরও ত্রিশ টাকা বাড়বে, যদি কলকাতায় গিয়ে তিনটে মাস থেকে একটা পরীক্ষা দিয়ে আর পাশ করে আসতে পারি।

—পরীক্ষা দাও তবে।

—দেব।

—কবে দিতে চাও?

—ভাবছি…এ মাসেই যদি…।

—ভাববার কি আছে?

—ভাবছি, কলকাতায় তিনটে মাস থাকার মত টাকা যোগাড় করে নিয়ে তারপর…।

ভাস্কর যেন হঠাৎ উৎসাহিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে।—চান্স চান্স, প্রতিশোধ নেবার একটা চান্স পাওয়া গেল পরেশ।

পরেশ—কিসের চান্স? কিসের প্রতিশোধ?

ভাস্কর—আমার এক মাসতুতো দাদার খুড়তুতো ভাই পূর্ণবাবু কলকাতাতে থাকেন। ভদ্রলোক আমাকে প্রায়ই জ্বালিয়ে থাকেন। বছরে অন্তত তিন-চারবার তাঁর কাছ থেকে এক-একটি লোক এসে আমার এখানে পাঁচ-সাত দিন থাকে, রাক্ষসের মত খায় আর চলে যায়। মাসতুতো দাদা খুব বড়লোক মানুষ; তিনিও পূর্ণবাবুর কথায় আমাকে অনুরোধ করে চিঠি দেন বলে, অর্থাৎ একটা চক্ষুলজ্জার জন্য আপত্তি করতে পারি না। কাজেই···আমি বলি, তুমিও আমার চিঠি নিয়ে পূর্ণবাবুর বাড়িতে গিয়ে তিন মাসের মত গেস্ট হয়ে আর গ্যাঁট হয়ে বসে থাক। খাও দাও, আর নিজের কাজ গুছিয়ে চলে এস।

পরেশ হাসে—পূর্ণবাবু যদি অখুশি হন, তবে কিন্তু···।

ভাস্করও হাসে—ওদেরও তো একটা চক্ষুলজ্জা আছে। অখুশি হলেও তোমাকে থাকতে দিতে বাধ্য হবে।

পরেশ—তবু···।

ভাস্কর—না, তুমি আপত্তি করো না, পরেশ। যদি ওরা অভদ্র ব্যবহার করে, তবুও বেপরোয়া হয়ে সব সহ্য করবে, তা না হলে ওরা জব্দ হবে না।

চুপ করে কি-যেন ভাবে পরেশ। তার পরেই বলে—আচ্ছা, দাও তবে একটা চিঠি।

ভাস্কর—দিচ্ছি কিন্তু মনে রেখ পরেশ; পূর্ণবাবু লোকটাকে একটু জব্দ করা চাই।···আর···আর একটা কাজ যদি করে আসতে পার···।

পরেশ—বল

ভাস্কর—নিজের জন্যে না পার অন্তত আমার জন্যে একটি মেয়ের খোঁজ নিয়ে যদি আসতে পার, তবে···।

পরেশ খুশি হয়ে হাসে।—এই তো, এতক্ষণে একটা ভাল কাজের কথা বললে। বল তাহলে···কিরকম মেয়ে খুঁজবো?

ভাস্কর বলে—সত্যি কথাটা তাহলে বলেই ফেলি।

পরেশ—বল।

ভাস্কর—চেহারাটা যদি সেই সনাতনবাবুর মেয়েটার মত হয়, তবে মন্দ হয় না পরেশ।

চমকে ওঠে পরেশ। ভাস্কর বলে—কিন্তু মেয়ের স্বভাবটা যেন ওরকমের বাজে স্বভাব না হয়। খুব ভাল করে খোঁজ নেবে।

চার

বাগবাজারের এক গলিতে পূর্ণবাবুর বাড়ি। একটি ছোটখাট দোতলা বাড়ি। নীচের তলায় একটা মাত্র থাকবার ঘর। উপর তলায় তিনটে। নীচের তলায় থাকবার ঘরের পাশেই ঘুঁটে আর কয়লার ঘর। একটা কাঁকড়া বিছা অসাড় হয়ে ঘরের মেজের উপর পড়ে আছে; তাও দেখতে পাওয়া যায়।

চিঠিটা পড়ে নিয়ে পূর্ণবাবু ভ্রূকুটি করে পরেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন; তার পরেই কাঁকড়া বিছেটার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে বলেন—বেশ এখানেই তাহলে থাক। আমার আপত্তি নেই।

পরেশ বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার শুধু একটা জায়গা দরকার।

পূর্ণবাবু—আমিও তো তাই বলছি, শুধু একটা জায়গায়ই দিতে পারি; খাওয়া-দাওয়ার জন্য অন্যত্র ব্যবস্থা করে নাও।

পরেশ—তা তো করে নিতেই হবে।

পূর্ণবাবু—করে নাও। আমরা অসুস্থ স্বামী-স্ত্রী কোন মতে টিঁকে আছি। তোমার খাওয়াদাওয়ার ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নেবার সামর্থ্য আমাদের নেই।

পরেশ বলে—কোন দরকারও নাই।

পূর্ণবাবু দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে আর চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন—ওরে ও বসুধা, ইদিকে একবার আয় দেখি; এঘরের কাঁকড়া বিছেটাকে ঝেঁটিয়ে বার করে দে। ভদ্রলোকের ছেলেকে ক'টা দিন থাকতে হবে তো।

পূর্ণবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে পরেশের অপলক চোখ ছুটো যেন দুঃসহ একটা কল্পনার জ্বালা সহ্য করতে থাকে। পৃথিবীতে বোধ হয় অনেক বসুধা আছে। শুধু সনাতনবাবুর মেয়েই একমাত্র বসুধা হবে কেন? নিশ্চয় আরও বসুধা আছে। এ এক অন্য বসুধা।

পূর্ণবাবু বলেন—আমার কি কম অশান্তি হে! এও এক সাংঘাতিক গলগ্রহ; কোথাকার এক কুটুম্বের মেয়ে এসে জুটেছে। বাপ তো চালাক, মরে বেঁচেছে। এখন আমি শালা জ্বলে মরি।

ঘরের মেঝেটার দিকে আনমনার মত তাকিয়ে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পরেশ।

পূর্ণবাবু আচ্ছা, চলি আমি। আমার এখন জপ সারতে হবে। তুমি বাপু ঘরের ঐ দিকে ঠাঁই নিও; বিছানাটা গুটিয়ে রেখ। সারা ঘর দখল করে বসো না। আমার গরুটা একদিন এ-ঘরেই থাকবে।

চলে যান পূর্ণবাবু। আর সেই মুহূর্তে যে-মেয়ে এসে পরেশের চোখের কাছে দাঁড়ায়, সে-মেয়ে সত্যিই যে পৃথিবীর সেই মেয়ে··· সেই একমাত্র বসুধা।

কিন্তু এই বসুধার গলায় দার্জিলিং পাথরের কোন মালা ঝিকমিক করে দোলে না। তবু চিনতে কোন অসুবিধে নেই। সেই চোখ, সেই ঠোঁট; আর সেই চমৎকার ভ্রূকুটি।

বসুধা বলে আপনি কি ক'রে এখানে এলেন?

পরেশ—আশ্চর্য!

বসুধা—কেন ?

পরেশ—তোমাকে এখানে দেখতে পাব, এরকম আশা যে স্বপ্নেও··· ।

বসুধা যেন জোর করে হাসতে চেষ্টা করছে। আর হাসিটাও একটা করুণ ঠাট্টার হাসি।—আশ্চর্য ! আশা করেছেন ?

পরেশ—তুমি দেখছি বিশ্বাস করতে পারছো না।

বসুধা—কেমন করে বিশ্বাস করবো বলুন ?

—কেন বিশ্বাস করবে না ?

—সেদিন যাকে বেহায়ার মত এত স্পষ্ট করে আমার আশার কথা বলেছিলাম, সে তো কুড়ি টাকা খরচ করে আমাকে সরিয়ে দিল। আমাকে তো সে আশা করেনি !

—তুমি তো নীহারকে···।

—চুপ কর। তোমার চোখ ছিল না।

—নীহার তো তোমাকে বিয়ে করতে আপত্তি করেনি।

—আমার আপত্তি ছিল।

—কেন ?

—আজও বুঝতে পারনি দেখছি। যাক্ গে। তুমি এখানে থেক না। চলে যাও।

পরেশ—চলে যাব ঠিকই। কিন্তু তোমাকেও যেতে হবে।

—না।

—কেন ?

—আমাকে দয়া করতে হবে না। কুটুমবাড়িতে দাসীর কাজ করছি ; ভালই আছি। কিন্তু তোমার দয়ার কাছে যাব না।

—বসুধা !

—না ; আজ আর ওভাবে কথা বলো না। আমি বিশ্বাস করতে পারবো না !

—বিশ্বাস কর।

কেঁদে ফেলে বসুধা।—না। তুমি তোমার বন্ধু ভাস্করের চেয়েও নিষ্ঠুর। একটুও ভাবলে না, একটুও মায়া হলো না, চুপে চুপে আমাকে সরিয়ে দিলে। বেশ করেছিলে! আমিও চুপে চুপে মরে যেতে চাই।

—বিশ্বাস কর বসুধা, আমি তোমাকে ভুলি নি। আমি তোমাকে…।

হেসে ফেলে বসুধা—হ্যাঁ, বিশ্বাস করি, তুমি আমাকে চুপি চুপি ভালবেসেছো! কিন্তু আমি কেন চুপি চুপি ভালবাসাকে বিশ্বাস করবো? কোন দরকার নেই। চুপি-চুপি ভালবাসার মত মিথ্যে আর কিছু নেই। যে সত্যি ভালবাসে সে চুপি চুপি ভালবাসে না।

পরেশ—না, আর চুপি চুপি নয়। আমি এখনই পূর্ণবাবুকে বলবো।

—কি বলবে?

—তোমাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন।

চমকে ওঠে, দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে বসুধা।

পূর্ণবাবু দরজার বাইরে থেকেই ঘড়ঘড় করে কথা বলেন—তবে তাই হোক্। সুলতাও বললে, তোমার সঙ্গে নাকি বসুধার আগেই চেনা-শোনা ছিল।

পরেশ বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পূর্ণবাবু হাঁপ ছাড়েন—আমাকে বাঁচালে হে পরেশ। যাই হোক্, বিয়ের জন্যে খরচটরচ করা কিন্তু আমার চলবে না।

পরেশ—আপনি খরচ করবেন কেন?

পূর্ণবাবু—তুমিই তাহলে সব খরচ দেবে?

—হ্যাঁ।

—টাকা আছে ?

—আছে।

—কত টাকা ?

—দেড়-শো টাকা।

—হ্যাঁ, তাতেই হয়ে যাবে।

পাঁচ

খবরটা শুনে খুব অপ্রসন্ন হয়ে যায় ভাস্কর। মুহুরী মহীতোষ বলেছে, আজ সকালে কলকাতা থেকে সস্ত্রীক ফিরেছেন পরেশবাবু।

—সস্ত্রীক ?

—হ্যাঁ, কলকাতাতেই বিয়েটা হয়েছে।

তিন মাস থাকবে কলকাতায়, পূর্ণবাবুর বাড়িতে থেকে পূর্ণবাবুকে জব্দ করবে। আর ভাস্করের জন্য একটি মেয়ের খোঁজ নিয়ে আসবে, যে মেয়ের মুখটা ঠিক সেই সনাতনবাবুর মেয়ে বসুধার মুখটার মত অদ্ভুত রকমের সুন্দর; এতগুলি প্রতিশ্রুতি পালন করবার দায়িত্ব নিয়ে আর কথা দিয়ে কলকাতায় চলে গেল যে পরেশ, সে সাত দিনের মধ্যে কলকাতা থেকে একেবারে সস্ত্রীক ফিরে এল ?

বাঃ, ভাস্করের বুকের ভিতরে যেন বিশ্রী রকমের জ্বালা ছড়িয়ে একটা অস্বস্তি উৎপাত করে বেড়াতে থাকে। একটা সন্দেহও যেন ধিকধিক করে জ্বলে। দেখতে ঠিক বসুধারই মত চমৎকার সুন্দর; এরকম একটা মেয়ের খোঁজ পেয়ে কি পরেশ শেষে নিজেই লোভ সামলাতে না পেরে···অসম্ভব। এতটা সন্দেহ করবার কোন মানে হয় না।

কিন্তু এভাবে সস্ত্রীক চলে আসবার মানেই বা কি ? এসেছে তো আজই সকালে। এখন প্রায় সন্ধ্যা; এতক্ষণের মধ্যে এখানে এসে

একটা খবরও দিয়ে যেতে পারলো না পরেশ। বিয়ে কে কি মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল ?

কিন্তু ভাস্করের মাথার ভিতরে যেন একটা জ্বালা ছটফটিয়ে কথা বলতে থাকে—নিজে গিয়ে স্বচক্ষে একবার দেখে এলেই তো হয়।

গ্যারেজ থেকে গাড়িটাকেও যেন একটা আক্রোশের আবেগে স্টার্ট দিয়ে বের করে ফেলে ভাস্কর। তারপরেই সোজা পরেশের বাড়ি। কারবালা রোডের শেষে একটা গলির মুখে পরেশের যে বাড়িটার দরজা আজ এই সন্ধ্যাতে একেবারে খোলামেলা হয়ে আর আলো জ্বালিয়ে হাসছে, সেই বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ওঠে ভাস্কর—পরেশ !

পরেশ এসেই হাসতে থাকে।—এই যে, তুমি এসেছো। খবর পেয়েছো বোধহয়।

ভাস্কর --হ্যাঁ, কিন্তু খবরটা কি ?

পরেশ —বিয়ে করে ফেললাম।

ভাস্কর হাসতে চেষ্টা করে। —কিন্তু এত হঠাৎ একটা বিয়ে ?

পরেশ- হঠাৎই হয়ে গেল।

পরেশের বাড়ির ভিতরের ঘরে রঙীন শাড়ি দিয়ে সাজানো যে মূর্তিটা অদ্ভুত একজোড়া নিবিড় হাসির চোখ নিয়ে চা তৈরী করছে, তারই দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে হেসে ফেলে ভাস্কর। চাপা স্বরে ফিসফিস করে বলে।—মনে হচ্ছে, সেই বসুধারই মত সুন্দর একটা মেয়ের খোঁজ পেয়ে আর তাকে বিয়ে করে তুমি…।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে পরেশ—সেই বসুধার মত নয়, সেই বসুধাকেই বিয়ে করেছি।

কি বললে ?

—হ্যাঁ, পূর্ণবাবর বাড়িতেই বসুধাকে দেখতে পেলাম !

—বুঝলাম। গম্ভীর হতে গিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় ভাস্কর। তারপরই যেন একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।—চলি।

পরেশ—চা খাবে না?

ভাস্কর—না। কিন্তু···।

কি-যেন বলতে চায় ভাস্কর। পরেশের মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে ভাস্করের চোখ দুটো যেন একটা অভিশাপের দৃশ্য সহ্য করতে থাকে।

পরেশ বলে—কি যেন বলছিলে?

ভাস্কর—তুমি আমার সঙ্গে এমন সাংঘাতিক ট্রেচারি কেন করলে?

পরেশের চোখ দুটো দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে।—তুমি তো জানতেই, ট্রেচারাস বলে আমার একটা সুনাম আছে।

শুক্লা নবমী

কোন দিন কোন দুঃস্বপ্নের মধ্যেও কখনো এই ভয় হয়নি যে, আমার স্বামীকে অশ্রদ্ধা করবার দুর্ভাগ্য আমার জীবনে কখনো দেখা দেবে। কিন্তু যা দুঃস্বপ্নের মধ্যেও অসম্ভব ছিল, আজ তাই হয়েছে। বুঝতে পেরেছি, স্বামীকে আজ অশ্রদ্ধা করছি। না করে পারছি না। সে মন আজ আর আমার নেই।

সত্যি সত্যি দেবতা বলেই তো একদিন মনে হয়েছিল তাঁকে, আমার এই স্বামীকে, যাঁকে আপনারা আজও বলেন আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবু, যিনি আজকাল সকাল বেলায় একটি এবং সন্ধ্যাবেলায় একটি টিউশনি ক'রে নিজের জীবনধারণ করছেন এবং আমাকেও ভাত কাপড় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন।

সকালেই হোক আর সন্ধ্যাতেই হোক্, টিউশনি সেরে যখন ক্লান্ত হয়ে, বিষণ্ণ ও শুকনো মুখ নিয়ে স্বামী আমার ঘরে ফেরেন, তখন হেঁসেলের দুয়ারে বসে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে দেখি। হাত-মুখ ধোওয়ার জলটুকু এগিয়ে দিতে অথবা একটা হাতপাখা তাঁর হাতের কাছে তুলে দিতে পারি না। ইচ্ছে করলেও পারি না।

এসব যে খুশিমনে করি, কিংবা ক'রে খুশি হই, তা মোটেই সত্য নয়। স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে পারি না ব'লে নিজেকেও যে ক্ষমা করতে পেরেছি, তা নয়। নিজের ওপর বেশ ঘেন্নাই হয়, রাগও করি। মনটা পুড়ে যায়। তবু সেই আগের মত হাতপাখা নিজের হাতেই তুলে নিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। হাসিমুখে কথ

বলা দূরে থাক্, স্বামী যদি হাসিমুখে আমার দিকে তাকান, তবুও প্রসন্ন হতে পারি না।

পারি না, কারণ আর সহ্য করতে পারি না। আপনারা তো তাঁকে বলেন আইডিয়ালিষ্ট, কিন্তু তিনিই তো আমার জীবনটাকে এমন শ্রদ্ধাহীন আর আশাহীন ক'রে দিলেন। আমাকে ভাত-কাপড় দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু দিতে পারছেন কই? কেন এমন দশা হলো? কে এই দশার জন্য দায়ী?

তিনিই দায়ী। শুধু ভাত-কাপড় কেন, আমার জন্য কার্সিয়ং-এ একটা সৌখীন বাড়ী ক'রে দেবার সামর্থ্যও তাঁর ছিল। বিয়ের রাতে বাসর-ঘরে তিনি যখন প্রথম আমার হাত ধরেছিলেন তখন তাঁর হাতে দু'টো হীরের আংটি দেখেছিলাম। বিয়ের আগেই শুনেছিলাম, মস্ত বড়লোকের ছেলের সঙ্গেই আমার বিয়ে হচ্ছে। শ্বশুর-বাড়ীতে প্রথম এসেও দু'চোখ ভরে প্রমাণ দেখেছিলাম, কথাটা মিথ্যে তো নয়; বরং যতখানি ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশী সত্য। বাপের এক ছেলে আমার স্বামী, গঙ্গার ধারে মস্ত বড় তাঁর পৈতৃক বাড়ী। ঘরের আসবাব-পত্রের দামই হবে পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর। লাইব্রেরীতে পাঁচ হাজারের চেয়েও বেশী বই, দাম বিশ হাজার টাকার চেয়ে বেশী। লোহার সিন্দুকে এক গাদা কোম্পানীর কাগজ দেখেছিলাম। দেখেছিলাম আমার স্বর্গীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সোনা আর জড়োয়া গয়নার একটি স্তূপ। ব্যাঙ্কের পাশ-বইও দেখেছিলাম সাত-আটটি।

কোথায় গেল সে সব? সবই গেছে আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবুর আদর্শবাদের অনাচারে ছিন্নভিন্ন হয়ে, ধূলো হয়ে, লুপ্ত হয়ে। আজ আমাকে নিয়ে তিনি থাকেন সালকিয়া বাজারের কাছে একটা গলির ভেতরে বিশ টাকা ভাড়ার একটা বাড়ীতে, যে বাড়ীতে আমার বাপের বাড়ীর টেরিয়ার কুকুরটা সাত দিন থাকলেও ঘেন্নায় মরে যাবে।

স্বামীর আমার কোন খারাপ খেয়াল নেই। আপনারা এবিষয়ে যতখানি নিঃসন্দেহ, আমি তার চেয়ে বেশী। বড়লোকের ছেলে হ'য়েও মদের বোতল তিনি বোধহয় জীবনে চোখেও দেখেন নি, সিগারেটও খান না, এমনকি জরদা দিয়ে একটা পান খেতেও তাঁর আপত্তি আছে। আর একটা যে সন্দেহ অনেক স্ত্রীই তাঁদের স্বামী সম্বন্ধে না করে পারেন না, সে সন্দেহের লেশমাত্রও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না আমার স্বামীর চরিত্রে। শুধু আমি কেন, আপনারাও সবাই জানেন, পরিচিতা বা অপরিচিতা মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনায় ও আচরণে তিনি কত সংযত আর কত শ্রদ্ধাশীল।

কিন্তু সবচেয়ে প্রগল্‌ভ তাঁর আদর্শবাদ! এক একটা দেশসেবা, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-উন্নয়ন, স্বদেশী, এবং হেনতেন নানা প্রকার আদর্শের উৎসাহে বিরাট পৈতৃক সম্পদের সব শেষ ক'রে দিয়ে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন এবং কি করছেন দেখুন!

এতটা আমি আশঙ্কা করিনি। এখনও স্বীকার করতে আমার কুণ্ঠা নেই, প্রথম প্রথম স্বামীর এই সব স্বদেশী ব্রত আর দেশসেবা এবং রাজনীতির ব্যাপারে তাঁর নিষ্ঠা ও উৎসাহ দেখে আমি মুগ্ধই হয়েছিলাম। দেবতার মতই তো তাঁকে মনে হতো। মনে হতো, তাঁর সুন্দর চেহারার চেয়ে তাঁর মনের ভেতরটা আরও কত বেশী সুন্দর।

দেখেছিলাম একদিন, বিয়ে হবার মাস কয়েক পরে, মাঘমাসের শীতের রাত্রে হঠাৎ গায়ের লেপ টেনে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—ললিতা, দেখতো আমার টেবিলের দেরাজে কিছু টাকা-পয়সা আছে কি না?

দেখে এসে বললাম—আছে, তিনশো টাকা আছে।

—দাও।

দেরাজ থেকে টাকা এনে দিলাম। স্বামী তখুনি বের হয়ে গেলেন।

ঘরের জানালার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। রাগ হচ্ছিল, চোখে জল আসছিল, এবং একটা সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গে ঘেন্নাও আসছিল মনের ভেতর। বড়লোকের ছেলে টাক নিয়ে মাঝরাতে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়, এ কি সত্যিই সে রকম বড়লোকের ছেলে? আমার কপালে কি সেই অভিশাপ এসে লাগলো?

শেষরাত্রে ফিরে এলেন স্বামী, আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবু। নিজের থেকেই বললেন—নিজের ওপর কেমন একটা ঘেন্না এল হঠাৎ, তাই না গিয়ে পারলাম না।

ব্যাপারটা এই। শীতের রাতে লেপ গায়ে দিয়ে আরামে শুয়েছিলেন স্বামী, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে মনে পড়লো, বাগ্‌দি পাড়ায় বাচ্চা বাচ্চা দুধের ছেলেগুলো এই শীতে শুক্‌নো কলাপাতার গাদার ওপর ঘুমিয়ে রয়েছে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফেরবার সময় নিজের চোখেই এই দৃশ্যটা তিনি দেখে এসেছিলেন। মনে পড়তেই আর থাক্‌তে পারলেন না, টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে বিনয় সাহাকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে, তার দোকান থেকে এক গাদা কম্বল কিনে নিয়ে বাগ্‌দি পাড়ায় ঘরে ঘরে বিলিয়ে দিয়ে তার পর ফিরে এলেন।

স্বামী হাসছিলেন, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনের ভেতরে কি যে হচ্ছিল তা আজও আমার মনে আছে। ইচ্ছে করছিল, তাঁর বুকের ভেতর মুখ আর চোখ গুঁজে দিয়ে দেখতে চেষ্টা করি, যেখানে লুকিয়ে আছে এমন স্থন্দর সোনার মতন একটা মন। ইচ্ছে করছিল, পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করি। কিন্তু আমাকে আমার মনের আনন্দ আর আবেগ প্রকাশের স্থযোগ না দিয়ে তিনিই আগে আমার হাত ধরে প্রশ্ন করলেন—কিন্তু তুমি এরকম জেগে বসে আছ কেন?

কি মমতা ছিল তাঁর সেই অনুযোগের মধ্যেও; কিন্তু আজ কই? আজ আমি যখন জ্বরভরা গায়ে এক বাটি পান্তা ভাত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত

কাঙ্গালের মতো পোড়া লঙ্কা দিয়ে মেখে গিলে-গিলে খেতে থাকি, তিনি একবার তাকিয়ে দেখেন শুধু। এক জোড়া শুকনো ঠাণ্ডা আর বেদনাহীন চোখ। তাকিয়ে দেখেই তাঁর ছেঁড়া খদ্দরের কামিজটা গায়ে চড়িয়ে টিউশনি করতে অথবা কোথায় কোন্ এক আদর্শ করতে বের হয়ে যান। আর আমি একা ঘরে বসে আমার জীবনের অভিশাপের হিসেব করতে থাকি।

আমার স্বামীর ওপর আমার এই অশ্রদ্ধাকে আপনারাও হয়তো ক্ষমা করতে চাইবেন না। বলবেন, আমি বড় অসহিষ্ণু, স্বামীর ওপর আমার সমবেদনা নেই। আপনারা বলবেন, চারুবাবুও তো কিছু স্বর্গসুখ উপভোগ করে বেড়াচ্ছেন না তিনিও তো আপনার মত মাঝে মাঝে পান্তা ভাতেই ক্ষুধা মিটিয়ে নিচ্ছেন, এবং তার জন্যে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন না। আপনারাও আদর্শের দোহাই দিয়ে বলবেন—চারুবাবুর স্ত্রী ললিতার মনটা ঠিক সহধর্মিণীর মন নয়। স্বামীর জীবনের দুঃখের ভাগ সমানভাবে গ্রহণ করতে যে স্বীকার না করে, তাকে কি···।

জানি, তাকে সহধর্মিণী বলা যায় না। কিন্তু আপনারা সে খবরটা জানেন কি, যে-খবরটা কোন খবরের কাগজে বের হয়নি, কিংবা আমি ও আমার স্বামী কোন দিনও বন্ধু বা প্রতিবেশীর কাছে কখনো মুখ ফুটে বলতে পারিনি?

আমার পন্টু মারা না গেলে আজ তার বয়স হতো তের বছর। কিন্তু আপনাদের এই কলকাতা সহরেই তিন বছর আগে, ঠিক যেদিন আপনারা নানা জায়গায় বুদ্ধ পূর্ণিমার অনুষ্ঠান ও উৎসব করছেন, ঠিক সেই দিন আমার কোলের ওপর শুয়ে থেকেই সে চোখ বন্ধ করলো। স্বামী আমার বুদ্ধ-পূর্ণিমার অনুষ্ঠানে বক্তৃতা সেরে ঘরে ফিরে এসেই দেখলেন. পন্টু ঘুমিয়ে পড়েছে চিরকালের মত। আপনাদের চারুবাবুকে অনেক উদ্বেগ থেকে মুক্তি দিয়ে বিদায় নিল পন্টু। আর

ডাক্তার ডাকতে হবে না, ডাক্তারের ফী যোগাড় করার জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না। শূন্য পকেট নিয়ে এক দোকান থেকে অন্য দোকানে বৃথা আর ওষুধ অন্বেষণ করে ফিরতে হবে না।

পল্টুর বয়স তখন দশ বছর। ছেলেটা ভুগছিল দু'বছর থেকে, যেদিন শালকিয়ার এই গলিতে এসেছি সেইদিন থেকে। আপনারা জানেন না, পল্টুর জন্য ডাক্তার যে টনিক আর ফুডের ফর্দ করে দিয়েছিলেন, দু'বছরের মধ্যে মাত্র একটি মাস নিয়মমত তাকে সেই ফুড আর টনিক খাওয়াতে পেরেছিলাম এবং মাত্র এই একটি মাসের চিকিৎসার খরচ যোগাড় করতে গিয়ে আমার গায়ে সোনার চিহ্ন বলতে শেষ যে বস্তুটা ছিল, এক জোড়া রুলি, তা'ও বিক্রী ক'রে দিয়ে টাকা যোগাড় ক'রেছিলাম।

এক কথায় বল্‌তে পারি, আমার পল্টুর চিকিৎসা হয়নি। ডাক্তার বার বার বলেছিলেন পুষ্টিকর খাবার খাওয়ান ছেলেকে, নইলে বিপদ হবে। কিন্তু আমার আইডিয়ালিষ্ট স্বামী ছেলের জন্য দৈনিক এক ছটাক ছানাও যোগাড় করতে পারেননি। টাকার জন্য চুরি করতে পারেননি। কিন্তু ধারের চেষ্টা করেছিলেন এবং ধার পাননি। পল্টুও আমার দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলো।

আপনারা দেখেননি আমার পল্টুকে। হাসপাতালের প্রসূতি-সদনের রিপোর্ট খুঁজলে এখনো দেখতে পাবেন যে, সদ্যোজাত শিশুটির দেহের ওজন রেকর্ড ওজন ব'লে লেখা রয়েছে রিপোর্টে, সেই শিশুটি হলো আমারই পল্টু। দু'বছরের মধ্যে এমন সুন্দর হাসি-খুশি, দুরন্ত রাজহাঁসের মত নরম নধর আমার পল্টু দেখতে দেখতে জিরজিরে একখানা হাড়মাত্র হয়ে গেল। ওষুধ পাইনি, ফুড পাইনি, এক ছটাক ছানাও পাইনি—পল্টুকে শুধু সাগুর জল খাইয়ে আর সরষের তেল মাখিয়ে আমি দু'টো বছর মরতে দিইনি। কিন্তু বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন নিজের থেকেই চলে গেল পল্টু।

আমি বলি, আমার স্বামীর ঐ আদর্শবাদই আমার পল্টুকে মেরেছে। ক্ষমা করতে পারি না তাঁকে। ভুলতে পারবো না, যে মানুষ মাঘ মাসের রাত্রে উঠে বাগ্‌দি পাড়ায় শীতার্ত ছেলেগুলির গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিয়ে এসেছে, সেই মানুষের ছেলে মরে গেল বিনা ওষুধে, বিনা খাদ্যে। পঙ্গুর মত, বোবার মত, আমার স্বামী মরা পল্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দু'চোখ জলে টলমল করছিল, কিন্তু আমি দেখছিলাম, কী কুৎসিত ও নির্মম মূর্তি। ওর আদর্শবাদের চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নেই সংসারে। ওর ত্যাগের চেয়ে বড় মূর্খতা আর কিছু নেই ত্রিভুবনে।

এখন হয়তো আপনারা কিছুটা বুঝতে পারছেন, কেন আমি আমার স্বামীর সম্বন্ধে এমন ক'রে হৃদয়হীনের মত কথা বলছি। আরও আশ্চর্যের কথা এবং আমার পক্ষে তো একেবারেই অসহ্য, তিনি এখনো দেশের শুভাশুভ নিয়ে, মহাপুরুষদের জীবনকথা নিয়ে, আরও অনেক-রকম তত্ত্ব নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে থাকেন। তাঁর ছাত্রদের কাছে বিবেকানন্দ ও গান্ধীর প্রেম সেবা অহিংসা ও ত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। মহাপুরুষের তিরোভাব দিবসে তিনি এখনো উপবাস করেন এবং আবির্ভাব দিবসে গঙ্গাস্নান ক'রে এসে গীতা পড়েন এবং দু'একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে বক্তৃতাও করে আসেন। শুনেছি তাঁর বক্তৃতা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়, কারণ তাঁর বক্তৃতায় নাকি একটা আন্তরিকতার আবেদন থাকে।

আপনারা যাই বলুন, আমার কাছে এসবই ভুয়ো, অর্থহীন, একটা অভিশাপ। অনেক সহ্য করতে পারি, এতটা সহ্য করতে পারি না।

অনেক দিন কেটে গেল। যতদিন না মরি ততদিন বেঁচে থাকতে হবে, এ ছাড়া জীবনের আর কোন অর্থ খুঁজে পাই না। ছেলেকে

হারিয়েছি, আর স্বামী ব'লে যিনি রয়েছেন, তিনি হলেন আদর্শবাদী। দু'বেলা টিউশনি করে যে সম্পদ নিয়ে আসেন তাতে সাপ্তাহিক রেশনটা শুধু নিয়মিত ঘরে আসে। কিন্তু আজকাল দেখে একটু আশ্চর্য লাগছে, স্বামী আমার যেন একটু চালাক হয়ে উঠছেন। মাঝে মাঝে ভাবি, এই চালাকী কাণ্ডজ্ঞানটুকু যদি আগে থাক্‌তো।

আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবুর অনেক ভক্ত আছে। আজকাল দশটা বাজলেই তিনি আর ঘরে থাকেন না, স্নান করেন না, ভাতও খান না। বলে যান—তুমি রান্নাবান্না ক'রে খেয়ে নিও ললিতা। আমার জন্যে চাল নিও না।

প্রথমে বুঝতে পারিনি, ব্যাপারটা কি। কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলাম।

ঠিক দশটা বাজলেই তিনি তাঁর কোন ভক্তছাত্রের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন এবং কখনো সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব, কখনো রাজনীতি, কখনো বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-বিবেকানন্দ-গান্ধীর আদর্শ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। আলোচনা করতে করতে ঘণ্টা দুই-তিন-চার পার হয়ে যায়। তাঁর ভক্ত ছাত্র অথবা ছাত্রের বাবা কিংবা মা অনুরোধ করেন- অনেক বেলা হয়ে গেছে চারুবাবু, এখানেই স্নান ক'রে দুটো খেয়ে নিয়ে···।

আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু মৃদু হেসে মৃদু একটু আপত্তির ভঙ্গী ক'রেন, কিন্তু পরমুহূর্তে রাজী হয়ে যান—হ্যাঁ, বেলা অনেক হয়েছে, এবং আপনারা যখন না খাইয়ে ছাড়বেন না, অগত্যা বাধ্য হয়েই···।

স্নান ক'রে, ছাত্রভক্তের বাড়িতে উদরপূর্তি ক'রে পাঁচ রকম অন্নব্যঞ্জনের আস্বাদ গ্রহণ ক'রে ঘরে ফিরে আসেন আমার স্বামী। লক্ষ্য করেছি, তাঁর স্বাস্থ্যটা আগের তুলনায় অনেক ভাল হয়ে উঠছে। যে ফতুয়াটা একেবারে ঢিলে হয়ে তাঁর কাঁধের হাড়ের সঙ্গে ঝুলতো, সে ফতুয়াটা এখন গায়ের সঙ্গে আঁটসাট হয়ে লেগে রয়েছে।

ভালই, তবে এই নতুন আদর্শবাদটা এতদিন চাপা ছিল কেন? যদি প্রথম থেকেই এইরকম বুদ্ধি রেখে তিনি আদর্শের সাধনা করতেন, তবে কি আর আজ আমাকে এমন শূন্য হয়ে, ছেলে হারিয়ে, স্বামীর ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে, এমন একটা অভিশপ্ত জীবনের বোঝা নিয়ে পড়ে থাকতে হতো? একটু বুদ্ধি রেখে, একটু সাবধান হয়ে আদর্শবাদী হলে কি আজ গঙ্গার ধারের বাড়ি, বাড়ির ফার্নিচার, এতগুলি ব্যাঙ্কের পাশ-বই, লাইব্রেরী আর সিন্দুকের ভেতরে গয়নার স্তূপ—সবই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেত?

আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু এতদিনে পয়সার মর্যাদা বুঝেছেন, এবং পয়সা বাঁচাবার কায়দাটুকুও শিখেছেন। উন্নতি হয়েছে তাঁর। কিন্তু …কিন্তু ভেবে পাই না, শ্রদ্ধা কেন আসে না? এখনো তো পারলাম না, আগের মতন তাঁর গা ঘেঁষে বসে তাঁর গায়ে পাখার বাতাস দিতে। উদ্বেগ হয় না, যদি বাড়ি ফিরতে রাত করেন। আমার মমতাহীনতার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, তাঁর শরীরটা এত ভাল হয়ে উঠেছে দেখেও আমি সুখী হতে পারছি না। কি যেন মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধছে।

কিছুদিন আগেও তো তাঁকে দেখেছি, কলতলায় হাত মুখ ধুচ্ছেন। দেখে রাগ হয়েছে। নিজের মূর্খতার দোষে সব-হারানো ও প্রবঞ্চত একটা মানুষের মূর্তি। কিন্তু আজকাল রাগ হয় না। বরং লজ্জা পাই। হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকলে মনে হয়, যেন একজন অচেনা পুরুষ ঘরে এসে ঢুকলো।

বড়লোকের ছেলে, দু'আঙ্গুলে হীরের আংটি, সেই অনেকদিনের আগের এক সুন্দর তরুণের মূর্তিটি আমার মনে আছে—আমার স্বামী, আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু। আর সেদিনও দেখেছি, ছেঁড়া খদ্দরের চাদর গায়ে দিয়ে বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠান সেরে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালেন—সেও তো আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু।

কিন্তু আজ তো আমার দু'চোখের দৃষ্টিতে অভ্যস্ত সেই পরিচিত মূর্তির কোনটিই দেখতে পাই না। ছাত্র-ভক্তের বাড়িতে পেটপুরে সুখাদ্য খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট চারুবাবু ঘরে ফেরেন। ভেঙেছে তাঁর সেই জোর, গেছে তাঁর সেই চোখের জল। হীরের আংটি গেছে, কিন্তু মৃত ছেলের দিকে তাকানো বুক-নিংড়ানো বেদনার অশ্রুজলও গেছে। অতীতকে ভুলে গেছেন, দু'বেলা পেটভরে খাওয়ার লোভ ও কৌশলবাদের কাছে হারিয়ে গেছে তাঁর বলিষ্ঠ দারিদ্র্যের আশীর্বাদ।

আজ বুঝতে পারছি, সত্যি সত্যি মনের গোপনে স্বামীর জন্যে যে এককণা ভালবাসার সোনা ছিল, এতদিনে আমার গায়ের সোনার শেষচিহ্ন রুলি দুগাছির মত তা'ও শেষ হয়ে গেল। আপনাদের কাছে এখনো হয়তো আইডিয়ালিস্ট সেজে ঘোরা-ফেরা করেন আমার স্বামী, কিন্তু আমি তো জানি, কি সর্বনাশ হয়ে গেছে এমন কঠিন একটা মানুষের আত্মার। একবার নয়, দুবার নয়, কতবারই তো দেখেছি, মরতে ভয় করেন না আমার স্বামী। অনেক ঘটনার কথা জানি, অনেক ঘটনার কথা শুনেছি। জলে-ডোবা মানুষকে তুলতে গিয়ে, বসন্ত রোগীর সেবা করতে গিয়ে, সত্যাগ্রহের সময়ে ঘাতক সৈনিকের উদ্যত রাইফেলের সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে—অনেকবার জীবন বিপন্ন করেছেন তিনি। সেই মানুষ আজ বাঁচতে চাইছেন, প্রাণের জন্য কী অদ্ভুত দরদ! বিনা ওষুধে মরেছে যাঁর ছেলে, তবু চুরি করতে পারেন নি যিনি, তিনি আজ কায়দা ক'রে, কি সূক্ষ্ম কৌশলে নিজের বিবেক আর আত্মসম্মানের ঘরে সিঁদ কেটে, প্রতিদিন যেচে আর সেধে পরের বাড়ি থেকে নেমন্তন খেয়ে ফিরছেন।

আমার ঘরে চাল বাঁচছে, পয়সাও বাঁচছে, রান্নাবান্নার হাঙ্গামাও কমেছে, কিন্তু তবু তো ভাল লাগছে না। আমি বেঁচে আছি মরবার জন্যে, আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু বেঁচে রয়েছেন কিসের জন্য? পেটপুরে খাওয়ার জন্য।

এমন মানুষকে শ্রদ্ধা করতে পারি, এবং আগের মত ভালবাসতে পারি, এমন শক্তি আমার নেই।

আগে রাগ করেছি তাঁর ওপর, কিন্তু তবু এই রাগের মধ্যেই ভালবেসেছি আর ভয় করেছি, ঐ আদর্শবাদীর কঠিন মেরুদণ্ডটিকে। কষ্ট সহ্য করতে পারিনি যখন, তখনই শুধু অশ্রদ্ধা করেছি। কিন্তু এখন······।

এখন আমার দিন যাচ্ছে এই ভাবেই। যখন স্বামী শুয়ে থাকেন ঘরের ভেতর, আর আমি বসে থাকি রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে, তখনো মনে হয় এ পৃথিবীতে আমি একা হয়ে গেছি, সব শূন্য হয়ে গেছে। আমার কপালে সিঁদুরের দাগ রয়েছে ; কিন্তু মনেই পড়ে না যে আমার স্বামী, অর্থাৎ আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু আমার এত কাছে রয়েছেন। যে সান্নিধ্য পৃথিবীর সব ঐশ্বর্যের চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করতাম একদিন, আজ তার কোন মূল্য নেই। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে না তাঁর কাছে ; শুনতে আপনাদের খুব খারাপ লাগবে, তবু না ব'লে থাকতে পারছি না। সময় সময় মনে হয়, সত্যি আমার স্বামী নেই। এই তো আজ আবার বেশ বেলা ক'রে ঘরে ফিরেছেন, এবং চৌকীর ওপর শুয়ে পান চিবোচ্ছেন আমার স্বামী। কিন্তু পরের বাড়ী গিয়ে যেচে ভাত খেয়ে, তার ওপর আবার পান খেয়ে ঘরে ফিরতে পারে, এমন একটা চরিত্রকে তো কখনো আমি আমার স্বামীর মধ্যে দেখিনি।

এই তো আমার জীবনের চেহারা—শূন্য হয়ে গিয়েও জ্বলছি। আজ বুঝতে পারি, এতদিন অশ্রদ্ধা করেছিলাম আমার স্বামী নামে মানুষটিকে নয়, তাঁর আদর্শবাদকে। আজ তাঁর সেই নিষ্ঠুর আদর্শবাদ নেই, এবং স্বামীর ওপর খুশি হয়ে ওঠবারই কথা। কিন্তু কই, খুশি হওয়া দূরে থাক্, আমার স্বামী আছে বলেই মনে হয় না। এ কী ভয়ানক জ্বালা, নিজেকে ধিক্কার দিই, সইতে পারি না।

এতদিনে আমার স্বামীর অর্থাৎ আপনাদের আইড়িয়ালিস্ট চারুবাবুর মেরুদণ্ড ভেঙ্গেছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমার এই দুঃখদীর্ণ ও অভিশপ্ত জীবনে যে একটা মাত্র অহংকার শেষ পর্যন্ত ছিল, তা'ও আজ চূর্ণ হয়ে গেছে। সালকিয়ার গলির এই জীর্ণশীর্ণ ও আলো-বাতাসহীন গৃহজীবনকেও সহ্য করেছি। আমার কোলের ওপর শুয়ে থেকেই ছেলে আমার চিরকালের মত চোখ বন্ধ করলো—তা'ও সহ্য করেছি। আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু ছেঁড়া কামিজ গায়ে দয়ে টিউশনি করতে বের হয়ে গেছেন, তা'ও সহ্য করেছি। সহ্য করতে কত কষ্ট হয়েছে তা কেউ জানে না। কিন্তু আজ আর সহ্য করতে পারি না। এক এক সময় ভাবি--কেন ঘরে ফিরে আসেন আপনাদের চারুবাবু? পরের বাড়ীর খাট-পালঙ্কে একটা ভাল বিছানার ওপর বেহায়া আরামে শুয়ে থাক্‌লেই তো পারেন। কেন আবার এই ছেঁড়া তোষকের ওপর ঐ বেহায়া শরীরকে শোয়াতে আসা?

দুই

চলছে দিন, যদিও এ'কে চলা বলে না। আজ বোধহয় শুক্লা নবমী। যদিও শ্রাবণ মাস, তবুও আকাশে ঘনঘটা নেই এবং সন্ধ্যেটাও এখনো শেষ হয়নি। রান্না-বান্না করিনি। উনি বাড়ী না আসা পর্যন্ত রান্না চড়াই না, কারণ, আজকাল আবার রাত্রি বেলাটাও কোথায় কোন ভক্তছাত্র, বড়লোক আত্মীয়, খুব চেনা বা অল্পচেনা বন্ধুর বাড়িতে এবং বল্‌তে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে ক'রে, শিয়ালদা ষ্টেশনে উদ্বাস্তুদের রলিফ শিবিরেও ঢুকে পড়ে এবং ভাত খেয়ে পরিতৃপ্ত মনে ঘরে ফেরেন। তাই সন্ধ্যা বেলাটা আমি আর রান্না চড়াই না। দু'মুঠো চাল-ডাল জলে ভিজিয়ে রাখি, আর হেঁসেলের চৌকাঠের কাছে বসে প্রেতিনীর মত সন্ধ্যের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সেই

ভেজানো চাল-ডাল চিবোই। কারণ আমাকে বাঁচতে হবে যতদিন না মরে যাই।

কলতলায় নবমীর চাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে। মনেও পড়েছে, আজকের দিনটা হলো আমাদের বিয়ের দিন। চৌকাঠের কাছে বসেছিলাম, কিন্তু মুহূর্তের মনের ভুলে যেন অন্য একটা পৃথিবীতে আর অন্য একটা যুগে চলে গেলাম। শ্রাবণের নবমী, চারদিকে ধূপ এবং চন্দনের গন্ধ, শাঁখও বাজছে। লোকের ভীড়। কত হাসি আর কলরব। উঠোনের ওপর আল্পনা। সমস্ত জগৎ সংসার আমাকে হুলুধ্বনি দিয়ে যেন ঠেলে নিয়ে গিয়ে একটি সুন্দর মুখের সামনে তুলে ধরলো। ধন্য হ'লাম, জীবন আমার অমৃতের স্পর্শ পেল সেই দু'টি স্মিত চক্ষুর দৃষ্টিতে।

শব্দ শুনে চম্‌কে উঠলাম। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন আপনাদের চারুবাবু। আমার দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কী অদ্ভুত শুক্‌নো হাসিহীন ও প্রাণহীন একজোড়া চোখের দৃষ্টি—এ কি সেই চোখ? মুহূর্তের মধ্যে আমার শুক্লা নবমীর চাঁদ ঐ নোংরা কলতলায় আছাড় খেয়ে মরে গেল।

শুনতে পেলাম, এবং বুঝতে পারলাম, বমি কংছেন স্বামী। শুনেছিলাম, বড়লোকের ছেলেরা রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে বমি করে। কেন করে তা'ও শুনেছিলাম। তবে কি স্বামী আমার আবার নতুন ক'রে বড়লোক হলেন? আগেও তো বড়লোক ছিলেন, কিন্তু তখন তো এভাবে রাতের বেলা ঘরে ফিরে বমি করেননি।

যাই হোক্, কিছুই আশ্চর্য নয়। বড়লোকের এঁটো খেয়ে বাড়ি ফিরলেও বোধহয় বমি করতে হয়। কোথায় গিয়ে কি খেয়ে এসেছেন জানি না। হয় গুরুভোজন হয়েছে, নয় বড়লোকের এঁটো গেলাসের কোন ঘৃণ্য বস্তু পান করে এসেছেন।

—ললিতা। আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবু ডাকলেন আমাকে।—বড় কষ্ট হচ্ছে ললিতা, একবার কাছে এস।

স্বামীর কথা শুনতে পেলাম, বমি করছেন আবার, তা'ও শুনতে পেলাম। কিন্তু মাপ করবেন আপনারা, আমার নির্মমতার কথা শুনে রাগ করবেন না, স্বামীর ডাক শুনেও আমি তাঁর কাছে যেতে পারলাম না। প্রচণ্ড একটা ঘৃণা এসে আমার সব শক্তি, বিবেচনা, কর্তব্যবুদ্ধি ও দায়িত্বজ্ঞান লুপ্ত ক'রে দিল।

স্বামী নিজেই উঠলেন। কলতলায় গিয়ে মুখ ধুয়ে নিলেন। জল তুলে নিয়ে এসে নিজেই ঝাঁটা দিয়ে ঘর পরিষ্কার করলেন। তার পর এক গেলাস জল খেয়ে শুয়ে রইলেন।

আমি শুয়ে রইলাম হেঁসেলের দাওয়ায়। আমি বুঝতে পারলাম, সত্যিই স্বামী নেই। একটা অপরিচিত পুরুষ এসে ঘরের ভেতর শুয়ে রয়েছে!

নিজের ওপরেও কম ঘেন্না হয়নি। ইচ্ছে হচ্ছিল, নিজের এই চোখ-মুখের ওপর এক শিশি অ্যাসিড ঢেলে দিই, কদর্য ও কুৎসিত হয়ে যাক্ ইহজীবনের মত, কেউ যেন আর চিনতে না পারে ললিতাকে—বাপ-মা'র আদুরে মেয়ে আর আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবুর সেই প্রাণের জিনিস ললিতাকে।

তিন

আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবুর আদর্শ চুলোয় গেছে, আর ললিতার ভালবাসাও শ্মশানে গেছে। সালকিয়ার গলিতে একটা ঘরে থাকে একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক। এ ছাড়া আর আমাদের জীবনের অন্য কোন পরিচয় নেই।

এক এক সময় ভাবি, মরবো তো শীগ্‌গির, খুব বেশি দেরি নেই। শরীরের সমস্ত হাড়ে কিরকম একটা ব্যথা দেখা দিয়েছে আজ মাস

তিনেক হলো। অসহ্য ব্যথা, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা। যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গে, তখন দেখি যে কলতলায় কিংবা উনোনের কাছে পড়ে আছি।

মরবো, একথাটা ভাবতে আনন্দ পাই না। কারণ যেভাবে মরলে হাসিমুখে মরতে পারতাম, সে সুযোগ নেই। জীবনের সেই শুক্লা নবমীর প্রথম উৎসবের দিনটিতে, যেদিন আপনাদের চারুবাবুকে প্রথম দেখেছিলাম, সেদিনও যদি একটি কথাও না ব'লে তাঁর চোখের সামনে মরে যেতাম, ভালই লাগতো বোধহয়। কিন্তু আজ আর তেমন সুখের মরণ কল্পনা করতেও পারি না। স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরবার সাধ আর নেই।

বোধহয়, খুব বেশি নিষ্ঠুরের কথার মত শোনাচ্ছে আমার কথাগুলি। কিন্তু না বলে থাক্‌তে পারছি না। মরবো তো ঠিকই, কিন্তু মরবার সময় আপনাদের চারুবাবুকে কাছে পাব কি? কাছে থাকলেও তিনি আমার মাথাটা কোলে তুলে নেবেন কি? সবচেয়ে বড় ভয়, স্বামীর কোলে মাথা রাখতে আমার ভাল লাগবে কি?

আজ হাড়ের ব্যথাটা বড় বেশি বেড়েছে। স্বামী চলে গেছেন সকাল বেলায় টিউশনি করতে। আজ আর আমি রাঁধবো না, রান্না করার শক্তি নেই, ইচ্ছেও নেই। আসল কথা হলো, রাঁধবার মত আজ ঘরে কিছুই নেই, রেশন আনা হয়নি। স্বামীকে রেশন আনতে বলেছিলাম, তিনি বললেন—টাকা নেই। ব'লেই বের হয়ে গেলেন।

শুয়েছিলাম হেঁসেলের চৌকাঠের কাছে। বেলা হয়েছে। বাসন-ওয়ালা হাঁক দিয়ে নতুন বাসন ফিরী করতে বের হয়েছে, শুন্‌তে পাচ্ছি। কলতলায় কাকের দল মিছামিছি এসেছে, এককণা ভাতের দানাও কলতলায় নেই।

কতক্ষণ শুয়েছিলাম জানি না। মুখের ওপর রোদ পড়তেই উঠে বসলাম। বুঝলাম, দুপুরও পার হয়ে গেছে। ভাবছি, স্নান কর্‌বো,

খোঁপা ভেঙে চুল এলিয়ে দিয়ে, গায়ের আঁচলটা নামিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে রোদের মধ্যে বসলাম, তেলের বাটি নিয়ে।

হঠাৎ স্বামী এসে ঘরে ঢুক্‌লেন। চমকে উঠ্‌লাম। আঁচলটা গায়ে জড়াবারও সময় পেলাম না। রাগে গা জ্বলে উঠলো। বলতে যাচ্ছিলাম—বের হও, এদিকে এস না। এবং সত্যি সত্যি ছ'চোখের দৃষ্টি বিষিয়ে নিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম।

স্বামী তাঁর কাঁধের ওপর থেকে ছেঁড়া চাদরটা তুলে নিয়ে দাওয়ার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন—কুসংস্কার, যত সব কুসংস্কার!

আমার মুখে যে ধিক্কারের ভাষাটা এসেছিল, সেটা আর বেজে উঠলো না। স্বামীর চিৎকারে বাধা পেলাম। কিন্তু কিসের কুসংস্কার?

স্বামীর চোখের দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক রকমের, মুখটা শুকনো, যেন একটা জ্বরের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করছেন। চেঁচিয়ে বললেন—টাকা আছে?

শুনে ঘেন্না হলো। উত্তর দিলাম না। কিন্তু তিনি তেমনি চেঁচিয়ে বললেন—সোনা-টোনা কিছু আছে? মনে মনে হাসলাম। কথা বললাম না।

কতক্ষণ চুপ ক'রে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলাম, তা জানি না। স্বামীও নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলেন। লোকটা সামনে থেকে এখনো সরে যাচ্ছে না, বিরক্ত হয়েই তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

শিউরে উঠলাম। তাঁর ছ'চোখে বড় বড় ছটো জলের ফোঁটা চিক্‌চিক্ করছে। ঠিক এমনি ভাবেই তাকিয়েছিলেন তিনি সেদিন পল্টুর মুখের দিকে—যেদিন পল্টু নিষ্প্রাণ হয়ে আমার কোলের ওপর শুয়েছিল।

কথা বললাম। জিজ্ঞেসা করলাম—কি হয়েছে? স্বামীও কোন

উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর কলতলায় গিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে নিলেন।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম, আপনাদের চারুবাবু এতদিন পরে আবার কাঁদেন কেন? কি এমন করুণ দৃশ্য দেখলেম যে ঐ চোখে আবার জল দেখা দিল? তবে কি তিনি এতদিন পরে দেখতে পেয়েছেন তাঁর ললিতাকে, তাঁর শুক্লা নবমীর চাঁদ আজ রোগজীর্ণ কখানা হাড় নিয়ে সালকিয়ার গলিতে স্যাঁৎসেঁতে ঘরের দাওয়ায় কিভাবে পড়ে আছে। কিন্তু আমি তো এখনো মরিনি, অমন ক'রে জলভরা চোখে তাকাবার দরকার কি?

বোধ হয় নিজের মনের দুর্বলতা আর মোহ নিয়ে বৃথা একটা স্বপ্ন দেখছিলাম আমি। স্বামী আমার একমুহূর্তেই সে স্বপ্ন ভেঙে দিলেন।

বললেন—কিছু টাকা যে আমার এখনই চাই।

—কত টাকা?

—অন্তত দশটাকা।

—নেই।

—কত আছে?

—এক টাকা।

—তা'তে হবে না। আরও চাই।

নিয়ে এস।

—কোথা থেকে আন্‌বো?

চেঁচিয়ে উঠলাম আমি—নিয়ে এস ভিক্ষে করে। কিংবা চুরি ক'রে। কী এমন কঠিন কাজ!

আমার চিৎকারের প্রত্যুত্তরে চিৎকার করলেন না স্বামী। শান্তভাবেই বললেন—অন্তত আট-দশটা টাকা না হলে হয় না। কি উপায় হতে পারে বলো?

বললাম—ঐ যে পড়ে রয়েছে তোমার সম্পত্তি, বেচে দিয়ে টাকা নিয়ে এস।

হেঁসেলের ভেতরে পেতল-কাঁসার থালা-ঘটি-বাটিগুলি দেখিয়ে দিলাম।

বাইরের রাস্তায় ঠিক সন্ধিক্ষণ বুঝে বাসনওয়ালাও হাঁক দিচ্ছিল। আপনাদের চারুবাবু আর এক মুহূর্ত দ্বিধা না ক'রে কতগুলি বাসন তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন এবং বাসনওয়ালার কাছে বেচে দিয়ে আটটা টাকা নিয়ে আবার ঘরে ঢুকলেন।

সমস্ত ঘটনাটা একটা হেঁয়ালির মত লাগছিল। বুঝতে পারছিলাম না কিছুই। আপনাদের চারুবাবুকে এতটা বিচলিত হতে, কিংবা চিৎকার ক'রে কথা বলতে এর আগে আমি কখনো শুনিনি।

তিনিই এ হেঁয়ালি পরিষ্কার ক'রে দিলেন। বললেন—যত সব কুসংস্কার। গিয়েছিলাম নীতুদের বাড়ী। কিন্তু দেখলাম নীতুদের বাড়িসুদ্ধ লোক আজ উপোস করছে, কারণ আজ গান্ধীজীর মৃত্যুদিন। আজ ওদের বাড়িতে রান্নাবান্না কিছুই হয়নি। যত সব কুসংস্কার।

রহস্যটা এতক্ষণে স্বচ্ছ হলো। নীতু হলো আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবুর একজন ভক্তছাত্র। আজ টিউশনি সেরে নীতুদের বাড়িতে দুপুর বেলায় হাজির হয়েছিলেন। প্রতিদিন যে কৌশলে পরের বাড়ি খেয়ে ফেরেন, সেই কৌশলের সাধনা করতেই সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেখলেন, তাঁর আদর্শে ও উপদেশে অনুপ্রাণিত নীতু আর নীতুর বাড়ির সবাই উপোস ক'রে গান্ধী তিরোভাব দিবস পালন করছে। ব্যর্থ হয়ে, লোভী ও ক্ষুধার্ত আইডিয়ালিস্ট আজ ফিরে এসেছেন ঘরে। কিন্তু যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। আজ তাঁকে খেতেই হবে, আজ আরও বেশী ক'রে খাবেন। মানুষের কুসংস্কার আজ আর সহ্য করতে পারছেন না আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবু। মহাপুরুষের তিরোভাব দিবসে উপোস করা একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কি? নীতুদের সঙ্গে

অনেক তর্ক করে ঘরে ফিরেছেন চারুবাবু। নীতুরাও একটু আশ্চর্য হয়ে গেছে।

টাকার দরকার এই জন্যেই। চারুবাবু আজ আরও বেশি করে খাবেন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আজ মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ করেছেন। তাঁর চোখে পাগলের দৃষ্টি, গায়ে যেন দুঃসহ জ্বরের জ্বালা এবং কথায় এক লোভী ও ক্ষুধার্ত জীবের ভয়ংকর কাতরানি।

স্বপ্ন আমার ব্যর্থ হয়ে গেল এবং তাঁর দিকে তাকাতে গিয়ে ঘেন্নায় চোখ জ্বলে উঠলো।

তিনি কিন্তু কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ করলেন না। টাকা নিয়ে বের হয়ে গেলেন এবং ফিরে এলেন বাজার থেকে একগাদা খাদ্যবস্তু কিনে নিয়ে—মাছ, কপি, সন্দেশ, ছানা, রাবড়ি, দই, সরু চাল, সোনা মুগের ডাল।

ব্যস্তভাবে বললেন—তাড়াতাড়ি রান্না চড়িয়ে দাও। আমি খেয়েই একবার বের হব। অনেক কাজ আছে

বিধাতা যদি আজ এসে আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে এই হুকুম দিতেন—থালায় আর বাটিতে বিষ সাজিয়ে নিজের হাতে স্বামীকে খেতে দাও, তাহলেও বোধহয় সেকাজ এত কঠিন মনে হতো না, যত কঠিন মনে হচ্ছে এই মাছ আর কপি রেঁধে স্বামীকে ওয়াতে। ধিক্ এ জীবন, ধিক্ আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবুর অদৃষ্ট!

বিকেল হয়ে গিয়েছিল। উনুন ধরালাম, এবং আমিও মরিয়া হয়ে আজ রান্না করলাম। তিন রকম মাছের তরকারী, ছানার ডাল্না, কপির বড়া এবং তরকারী, ভাজা পাঁচ রকম, ডাল রাঁধলাম তিন রকম।

রাঁধতে রাঁধতে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল। আলো জ্বাললাম। দেখলাম আপনাদের চারুবাবু কলকাতায় স্নান করছেন।

রান্না শেষ হলো। ঘর ধুয়ে মুছে, শুকনো কাপড় দিয়ে আর

একবার ভাল করে মেজেটা ঘষে দিয়ে, তারপর আসন পাতলাম। সব খাবার বাটিতে ও রেকাবিতে, এবং ভাতের একটা স্তূপ থালার ওপর সাজিয়ে রাখলাম। প্রদীপটাকে এই ভূরিভোজের যজ্ঞক্ষেত্রের পাশে রেখে দিলাম।

তারপর ইচ্ছে করছিল, ঘর থেকে ছুটে বাইরে চলে যাই। আপনাদের আইডিয়ালিষ্ট চারুবাবু একটা ক্ষুধার জীবমাত্র হয়ে এই খাদ্য গিলে গিলে মহাপুরুষের তিরোভাব দিবসটাকে হিংস্র বিদ্রূপে ব্যর্থ করছেন—এ দৃশ্য যেন আর দেখতে না হয়। কিন্তু কোথায় যাব? হাড়ের ব্যথা আমাকে পঙ্গু করে রেখেছে। মরতে হলে যেন এই দৃশ্য দেখার আগে এই দাওয়ার ওপরে নিঃশব্দে মরে যাই।

বোধ হয় আবার স্বপ্ন দেখছিলাম। যখন তন্দ্রা ভাঙলো, তখন বুঝলাম দাওয়ার ওপর শুয়ে আছি। রান্নাঘরের ভেতর প্রদীপটা তখনো মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে এবং সাজানো খাবার সবই পড়ে আছে। আপনাদের চারুবাবু এখনো খেতে আসেননি।

ওঘরের ভেতরেও আলো জ্বলছে বোঝা যায়, কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ শোনা যায় না। কি জানি এতক্ষণ ধরে নীরবে ঘরের ভেতর বসে কি করছেন আপনাদের চারুবাবু?

আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, রাত গভীর হয়েছে। সমস্ত গলিটাই নিঝুম হয়ে আছে। একটু পরেই পাশের তেতালা বাড়িতে দেয়াল-ঘড়িতে ঘণ্টা বাজলো—রাত দু'টো।

সে কি? আপনাদের চারুবাবু কি তবে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন?

উঠলাম। ছোট উঠোনটা পার হয়ে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে তাকালাম।

না, ঘুমিয়ে পড়েননি আপনাদের চারুবাবু। তিনি বসেছিলেন ঘরের মেজেতে একটা আসনের ওপর। তাঁর সম্মুখে একখানা গীতা

খোলা পড়ে রয়েছে। ধীর স্থির একটা প্রশান্ত মূর্তি, এক মনে গভীর আগ্রহে এবং নিষ্পলক চক্ষে গীতা পড়ছেন।

চোখ দু'টি নিষ্পলক কিন্তু দুটো বড় বড় জলের ফোঁটা চিক্ চিক্ করছে সেই দু'টি চোখের কোণে।

ভয়ে ভয়ে শুধু একবার বললাম অনেক রাত হয়েছে, খেয়ে নাও।

আপনাদের চারুবাবু উঠলেন না, কোন উত্তর দিলেন না। গীতা বন্ধ ক'রে আর চোখ মুছে বসে রইলেন।

তবে কি তিনি সত্যিই আজ উপোস করবেন, মহাপুরুষের তিরোভাব দিবসের সম্মান রাখবেন? তবে এই ভয়ানক খাই-খাই কাণ্ড করলেন কেন? একি নিজের হাতে নিজেরই আত্মার ওপর কশাঘাত? কিংবা জীবনের সবচেয়ে বেশি দুঃসহ দুঃখের সঙ্গে একটা পাগলামি? অথবা অভিমান, মা-মরা ছেলেমানুষ যেমন মায়ের ওপর অভিমান করে?

শেষ পর্যন্ত উঠলেন না, খেলেনও না আপনাদের চারুবাবু। আজ ঘরে খাবার আছে, অনেক আছে এবং নানারকম আছে; অন্তত আজকের দিনটার মত আছে, তবু খেলেন না। যা ছিল না, তাই এইভাবে আছে ক'রে নিয়েছেন, নইলে বোধহয় উপোস করে শান্তি পাচ্ছিলেন না। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

কাছে এগিয়ে গিয়ে সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। আমাকে ওভাবে দেখে একটু যেন বিব্রতভাবে ভয়ে ভয়ে বললেন—কিছু মনে করো না। ঘরে খাবার না থাকলে সত্যি সত্যিই তো আর ব্রতের উপোস হয় না। তাই···

হ্যাঁ তাই। আর তাঁকে কথা বলতে হয়নি, কারণ আমিই আর বলতে দিইনি। কারণ, দেখতে পেয়েছি এক অসহায় নিঃস্বের ভগ্নব্রত জীবনের জ্বালা কোথায় জ্বলছে।

তার পর কি হয়েছিল, সব মনে নেই। শুধু এইটুকু জানি যে, সে রাত্রি ভোর হবার আগে ঘুম ভেঙ্গেছিল। বুঝলাম, স্বামীর বুকের

কাছে মাথা রেখে শুয়ে আছি। ঘরের ভেতরে প্রদীপটা তখনো জ্বলছিল। মনে হলো, শুক্লা নবমীর চাঁদ থেকে একমুঠো আলো এসে পড়ছে আমার জীবনের বাসর-ঘরে। স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকালাম। দেখলাম, ইনিই তো সেই।

সকাল হলে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। হেঁসেলে ঢুকতেই দেখলাম, বিড়ালে সব খাবার খেয়ে চলে গেছে।

তার পরের ঘটনাগুলি আপনাদের শোনাবার আর প্রয়োজন হবে না। আমি বেঁচে আছি মরবার জন্য, এবং বিশ্বাস করি স্বামীর কোলে মাথা রেখে যদি মরি, তবে সে মরণ বড় সুখেরই হবে।

সমাপিকা

কোথায় গেল মানসী ?

অফিস ছুটি হয়েছে বিকেল পাঁচটায়, বাড়ি পৌঁছতে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় লেগেছে। এখনই, শুধু এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে মানসীকে সঙ্গে নিয়ে বের হবে তাপস, তবে চৌরঙ্গীর সেই সিনেমা-ভবনের কাছে ছ'টার মধ্যেই পৌঁছে যেতে পারা যাবে। সাধারণ ক্লাসের সীট যদি না পাওয়া যায়, তবে অসাধারণ ক্লাসের ছুটো সীট পাওয়া যাবে নিশ্চয়। না হয় তো স্পেশ্যাল ক্লাসের সীট, তাও যদি না পাওয়া যায়, তবে ছোট একটা বক্স তো পাওয়া যাবেই। আজ গোটা পঞ্চাশেক টাকা হেসেখেলে ছড়িয়ে দিতেও রাজি আছে তাপস। কাল জেনেছিল তাপস, মাইনে বেড়েছে। তিন বছর ধরে আড়াইশো টাকাতে ঠেকে-থাকা মাইনেটা এক দফাতে বেড়ে গিয়ে সাড়ে চারশো টাকায় দাঁড়িয়েছে। রিটায়ার ক'রে গেলেন যে সুকান্তবাবু—তাঁরই জায়গায়,—অর্থাৎ জেনারেল ম্যানেজারের সেকেণ্ড অ্যাসিস্টেন্টের পোস্টে পার্মানেণ্ট হ'য়েছে তাপস। ছু'শো টাকা মাইনে বৃদ্ধির সৌভাগ্যটিকে আজ একশো টাকারও একটা খুশির খরচ দিয়ে অভ্যর্থনা ক'রতে রাজি আছে তাপস। এখনই বের হ'য়ে গেলে আর একটা ট্যাক্সি ধরে নিতে পারলে ছ'টার আগেই সেই সিনেমা ভবনের কাছে পৌঁছে যেতে পারা যাবে। ছবিটাকে শুরু থেকেই দেখতে পাওয়া যাবে।

কিন্তু মানসী কোথায় ?

ঝি ভানুর মা বলে—বউদি কোথায় যে গেলেন, আমাকে কিছু ব'লে যান নি। আমাকে শুধু ব'লে গেছেন,—ঘর পাহারা দাও ;

আর দাদাবাবু এলে পাশের বাড়ি থেকে চা এনে দিও। পাশের বাড়ির রাণুদিদিকেও বলে রেখে গেছেন।

তাপসের চোখে বেশ কঠোর একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে।—কখন বেরিয়েছে তোমার বউদি ?

ভানুর মা—আপনি অফিস যাবার একটু পরেই।

তাপস—প্রায়ই এভাবে বেরিয়ে যায় বোধ হয় ?

ভানুর মা—তা আমি কি ক'রে ব'লব গো দাদাবাবু ? আমি তো সেই সকালেই বাসন মেজে চ'লে যাই ; আসি আবার বিকেলে।

তাপস সেই রকমই কঠোর গম্ভীর ও অপ্রসন্ন একটা মুখ নিয়ে যেন আনমনার মত বিড়বিড় করে।—তার মানে, প্রায়ই বেরিয়ে যায়, আর আমি অফিস থেকে আসবার আগেই ফিরে আসে। আজ বোধহয় সন্ধ্যার পরে কিংবা বেশ রাত ক'রে ফিরবে ব'লেই……।

হ্যাঁ, একটা ব্যবস্থা ক'রে রেখে গেছে মানসী। ঘর পাহারা দেবার জন্য ভানুর মাকে রেখে গেছে ; তাপসের চা-এর জন্য পাশের বাড়িতে বলে গেছে। চমৎকার থিয়েটার ক'রতে পারে মানসী। তাপসের চোখের কাছে বেশ চতুর আর কপট একটা মায়ার আবরণ ঝুলিয়ে রেখে দিয়ে ভয়ানক একটা ইচ্ছার অভিসারে বের হ'য়ে গিয়েছে মানসী।

তিন বছর হ'ল বিয়ে হ'য়েছে। বিয়ের পর সেই যে এই বাড়িতে এসে ঠাঁই নিয়েছে মানসী, তারপরে আর একটি দিনের জন্যও এলগিন রোডের বাড়িতে যায় নি। দমদমের এক নিভৃতে তাপসের এই বাসাবাড়িটাকে একেবারে চিরকালের ঠাঁই মনে ক'রে সুখী হ'য়ে গিয়েছে মানসীর অন্তরাত্মা। মানসীর চোখে মুখে যেন সেই রকমেরই একটা তৃপ্তির স্বীকৃতি ঝক্‌ঝক্ ক'রে হাসে। অথচ মানসী জানে, তিন বছর আগে মানসীর অদৃষ্টটা এলগিন রোডেরই একটা বিরাট বাড়ির অন্তঃপুরে গিয়ে ঠাঁই নেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল। পুলক বিশ্বাসের মত বড়লোক-ছেলের সঙ্গে যার বিয়ে প্রায় অবধারিত ছিল,

তাকেই দমদমের এই আশি টাকা ভাড়ার বাড়িতে উঠে আসতে হয়েছে

এলগিন রোড়ের জেঠামশায়ের বাড়ি, যে বাড়িটা পুলক বিশ্বাসের সঙ্গে মানসীর বিয়ে দেবার জন্য অনেক আশা আর চেষ্টা করেছিল, সে বাড়িটার বিরুদ্ধে যেন একটা অভিমান আছে মানসীর মনে। তা না হ'লে এই তিন বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও এলগিন রোডের জেঠামশাইয়ের বাড়িতে যায়নি কেন মানসী ?

মানসীকে হেসে হেসে কতবার প্রশ্ন করেছে তাপস—ব্যাপারটা কি হ'য়েছিল লজ্জা না করে বলেই ফেল না, সে বিয়ের চেষ্টা ভেঙ্গে গেল কেন ?

মানসী আমি কি করে ব'লব ?

তাপস -তুমি কিছুই জান না ?

মানসী না।

তাপস পুলক বিশ্বাসের বাবা তোমার জেঠামশায়ের কাছে অনেক টাকার পণ দাবি ক'রেছিলেন ?

--জানি না।

পুলক বিশ্বাস রাজি হয় নি ?

---তা জানি না।

তুমি রাজি ছিলে কিনা সেটা তো জান ?

--জানি বৈ কি।

-কি ?

- আমি রাজি ছিলাম।

—তবে তো মনে হচ্ছে, তোমার মনে বেশ একটা…।

—কি ?

---একটা আক্ষেপ আছে।

---ছাই আছে।

—তবে এলগিন রোডের জেঠামশাইয়ের বাড়িতে যাও না কেন ?

—একদিন হয়তো যাবো। কিন্তু এখন যেতে ইচ্ছে করে না।

—কেন ? ও বাড়িতে গেলে পুলক বিশ্বাসের বাড়িটাকে দেখতে পাওয়া যায় ব'লে ?

—সেটাও একটা কারণ বটে।

—আর কি কারণ থাকতে পারে ?

—কত কারণই তো থাকতে পারে। সে সব জেনেই বা তোমার লাভ কি ?

—আমি তো বুঝতে পারছি না, আর কি কারণ থাকতে পারে ?

মানসী হাসে—তোমাকে বিয়ে করতে আমি রাজি হ'য়ে গেলাম কেন, এরকম একটা প্রশ্ন তো সে-বাড়িতে থাকতে পারে ?

তাপসের মুখটা কিন্তু গম্ভীর হয়ে যায়।—এইবার খাঁটি কথাটা বলেছ।

কথাটা একটু বিস্ময়ের প্রশ্ন বটে। এলগিন রোডের এত বড় ঐশ্বর্যের একটা বাড়ির এক জেঠামশাইয়ের ভাইঝি কেন যে তাপসের মত অবস্থার মানুষকে বিয়ে ক'রতে রাজি হয়ে গেল, এই প্রশ্নের বিস্ময় এখনও শান্তভাবে সহ্য করতে পারেনি এলগিন রোডের জেঠামশাই আর জেঠিমা। জেঠিমারই আত্মীয়া হন এক মহিলা, যিনি হলেন তাপসের বন্ধু মিহিরের মা, তাঁকে একদিন এলগিন রোডের বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল তাপস। মাত্র আধঘণ্টা সে বাড়ির বারান্দার চেয়ারে বসেছিল আর চা খেয়েছিল তাপস। চা এনে দিয়েছিল মানসী।

তারপরেই একদিন মিহিরের কাছ থেকে একটা বিস্ময়ের খবর শুনতে পেয়েছিল তাপস। মিহিরের মা তাপসের সঙ্গে মানসীর বিয়ের কথা তুলেছিলেন। মানসীর জেঠিমা বলেছিলেন,—তা হয় না। মাত্র আড়াই শো টাকা মাইনে পায় ছেলে, তার সঙ্গে,—না,—মানসীর

মত মেয়ের বিয়ে যে একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু মানসীই নাকি বলেছিল,—খুব সম্ভব। তারপরেই একদিন বিয়ে হ'য়ে গেল।

মনে হয়েছিল তাপসের,—মানসী যেন কারও উপর রাগ ক'রে, কিংবা ভাগ্যটারই উপর রুষ্ট হ'য়ে আত্মহত্যার মত একটা কাণ্ড করবার জন্য তাপসকে বিয়ে ক'রবার জেদ ধরেছিল।

যাই হোক আজ কোথায় গেল মানসী? সারদা পিসিমার বাড়িতে? ভোলা কাকার বাড়িতে? শাড়ি কিনতে কলেজ স্ট্রীট্ মার্কেটে? চিড়িয়াখানাতে? জাদুঘরে?

তাপসের নিশ্বাসের মধ্যে ধিকধিক ক'রে সন্দেহটা জ্বলতে থাকে। ওসব জায়গায় যেতে হ'লে এমন একটা গোপনতার খেলা খেলবে কেন মানসী? তা হ'লে তো আগেই ব'লে রাখত। ওসব জায়গায় যেতে হ'লে তাপসকে এড়িয়ে যাবারও কোন দরকার হয় না। বরং, এটাই স্বাভাবিক যে ওসব জায়গায় যেতে হ'লে স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গেই যেতে চাইবে; একা যেতে চাইবে না; একা যেতে ভাল লাগবে না।

—আমি চা খাব না, ভানুর মা।

বাড়ি থেকে বের হ'য়ে যায় তাপস। আর, বুকের মধ্যে সেই সন্দেহ-ময় কৌতূহলটা যেন হিংস্র হ'য়ে জ্বলতে থাকে। কোথায় গেল মানসী?

দুই

না; মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের সারদা পিসিমার বাড়িতে আসেনি মানসী। পিসিমা বললেন—তোমাকে না ব'লে ক'য়ে হঠাৎ এখানে চ'লে আসবে কেন মানসী? মানসী তো এমন ভুলো মনের মেয়ে নয়।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের ভোলা কাকার বাড়িতেও আসেনি মানসী। ভোলা কাকা বাড়িতে নেই। কাকিমা বললেন—সনৎ বললে……।

—কি বললে সনৎ?

—ওরে সনৎ, এদিকে আয় দেখি। তাপসদা কি বলছেন শোন।

সনৎ এসে বলে—হ্যাঁ, বউদিকে দেখেছি।

—কোথায়?

—ট্রামে।

—কোথাকার ট্রামে?

—ভবানীপুরের দিকে যাচ্ছিল যে ট্রাম, সেই ট্রামে।

ঠিকই দেখেছে সনৎ। ভবানীপুরের দিকে যাবার ট্রাম যে এলগিন রোড পার হ'য়ে যায়! ঐ এলগিন রোডেই যে পুলক বিশ্বাসের সেই বাড়ি; যে বাড়ি একদিন মানসীর আশার স্বপ্ন হ'য়ে উঠেছিল! সাহেবী সাজে সেজে আর জামার বুকের বোতামে লাল গোলাপের কুঁড়ি ঝুলিয়ে লনের উপর পায়চারি করে বেড়ায় যে পুলক বিশ্বাস, তাকে মানসী আজও দু'চোখের পিপাসা নিয়ে দেখে দেখে তার অশান্ত স্বপ্নটাকে শান্ত ক'রতে চায়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠেছে। এলগিন রোডের পথের আলো ঝলমল করছে। এই তো জেঠামশাইয়ের বাড়িটা; আর, তার পাশেই ঐ তো পুলক বিশ্বাসের বাড়ি।

ফটক বন্ধ। পুলক বিশ্বাসের বাড়ির বারান্দায় কোন আলোও জ্বলছে না। কিন্তু তবু বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়,—লনের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিপুল এক প্রেমিকের গর্বিত মূর্তি,—পুলক বিশ্বাস। আর তাঁরই পাশে এক তরুণীর মূর্তি।

বুঝতে অসুবিধে নেই, কে এই তরুণী, যার বিহ্বল শরীরটা হেলে দুলে পুলক বিশ্বাসের পাশে পাশে হেঁটে গল্প ক'রছে। মানসীর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় না; কিন্তু কী ভয়ানক এক আবছায়াময়ী মায়াবিনীর মত মূর্তি ধ'রে গোপনে প্রেমিকের সঙ্গে স্বপ্নের কথা বলাবলি করছে মানসী।

আর দেখবার কিছু নেই। আর জানবারও কিছু নেই। শুধু

তাপসের নিঃশ্বাসের বাতাসটা যেন কথা ব'লছে ;—এবার বুঝলে তো অন্ধ, কত বড় এক কৌতুকিনী নারী দমদমের এক আশিটাকা-ভাড়ার বাড়িতে এক ভদ্রলোকের স্ত্রী সেজে স্বামীর আত্মাটাকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে দিন পার ক'রে দিচ্ছে !

বাস্, আর তো কিছু ভাববারও দরকার নেই। এখানেই চির-কালের মত ঐ লনের উপরে পুলক বিশ্বাসের ইচ্ছার সঙ্গিনী হ'য়ে ঘুরে বেড়াক মানসী। দমদমের বাড়ির দরজাতে আজই যে-খিল প'ড়বে সে-খিল আর কোনদিন খুলবে না। মানসী যদি ফিরেও যায়, তবু মানসীর ছায়াও আর সে-বাড়ির দরজা পার হ'য়ে ভিতরে ঢুকবার সুযোগ পাবে না।

ট্যাক্সি ধরে তাপস। তারপর সোজা পথ দমদম ; কোথাও থামবার দরকার নেই। তাপসের আহত আত্মাটা যেন মানসী নামে একটা অভিশাপের ভয় চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছুটে চ'লে যায়।

তিন

ট্যাক্সির পাওনা মিটিয়ে দিয়ে আর ঘরে ঢুকেই চ'মকে ওঠে তাপস। পাশের ঘরে যেন চুড়ির শব্দ বাজছে। স্টোভটাও শব্দ ক'রে জ্বলছে। আর, আলনার কাছেই মেজের উপর লুটিয়ে প'ড়ে র'য়েছে একটা শাড়ি। তাপসের দুরন্ত সন্দেহের চোখ দুটো যেন স্তব্ধ হ'য়ে দেখতে থাকে,—সত্যিই একটা প্রহেলিকা এসে ঘরের ভিতর ঢুকেছে। সত্যিই যে মানসী।

মানসী বলে—কোথায় গিয়েছিলে ? ভানুর মা ব'ললে, তুমি চা না খেয়েই হন্তদন্ত হ'য়ে বেরিয়ে গিয়েছ !

তাপস—আমি তো হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটেছিলাম ; কিন্তু তুমি আমাকে না ব'লে ক'য়ে সকাল দশটায় কোথায় গিয়েছিলে ?

মানসী হাসে—কেন? তাতে কোন অপরাধ হ'য়েছে?

তাপস—এতক্ষণ ছিলেই বা কোথায়?

মানসী এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে।—কোথায় ছিলাম ব'লে তোমার মনে হয়?

তাপস—তুমি আগে জবাব দাও।

মানসী—চা খাবার আগে হাত ধুয়ে এটা খেয়ে নাও।

তাপস—কি এটা?

মানসী—দেখতে পাচ্ছ না? সন্দেশ চেন না নাকি?

তাপস—দেখতেও পাচ্ছি, সন্দেশও চিনি; কিন্তু বুঝতে পারছি না।

মানসী—কালীঘাটের প্রসাদ।

তাপস—কালীঘাটের প্রসাদ কেমন ক'রে এখানে এল?

মানসী—কালীঘাটে গিয়ে পূজো দিয়ে এলাম।

তাপস—কি বল'লে? পূজো দিয়ে এলে?

মানসী—মানত ক'রেছিলাম।

তাপস—কিসের মানত?

মানসী—তোমার চাকরির উন্নতির মানত।

তাপস—একাই গিয়েছিলে নাকি?

মানসী—একা যাব কেন? পাশের বাড়ীর হিরণদি সঙ্গে ছিলেন।

তাপস—তা হ'লে…

অদ্ভুতভাবে হাসতে হাসতে মাথা হেঁট করে ফেলে তাপস। আর মানসীর হাত ধরে কি যেন বলতে চায়।

মানসী—কি হ'ল? হাসছো কেন?

তাপস—এবার তা'হলে তোমাকে আরও একটা মানত ক'রতে হয় মানসী।

মানসী—আবার কিসের মানত?

তাপস—মানত কর, আমার মাথাটার যেন একটু উন্নতি হয়।

সমাপ্ত